ত্রৈমাসিক

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ ঃ ৪ ॥ সংখ্যা ঃ ১৬ ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৪ সংখ্যা : ১৬

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি পুরানা পল্টন,
নোয়াখালী টাওয়ার, সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২
ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬, ০১৭১১ ৩৪৫০৪২
www.ilrcbd.com
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

মুসলমানের দেশে মূর্তি স্থাপনা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণীয় হতে পারে না

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও বিশ্বাস আছে। তার ভিত্তিতে সে জীবিত থাকে, এগিয়ে চলে। আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীরা স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্তার অধিকারী। আমরা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাস করি, আমরা বাংলাদেশী। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমরা বাঙালী। আমাদেরও একটা নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জাতীয় আদর্শ আছে। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাশি থেকে সাতাশি ভাগ লোক আল্লাহ রসূলে বিশ্বাস করে। তারা মুসলিম। বাদবাকি অমুসলিম যারা আছে তারাও ধর্মপ্রাণ। মুসলিম ও অমুসলিম মিলে পাশাপাশি আমরা এখানে দৃষ্টান্তমূলক ধর্মীয় সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করছি হাজার বছর ধরে। তবে ১৯৭১ সালে মুসলমানদের প্রচেষ্টায় মুসলিম ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন মুসলিম দেশের জন্ম হবার কারণে এদেশে মুসলিম সংস্কৃতি, মুসলিম ভাবধারা ও মুসলিম চিন্তার প্রাধান্য হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলিম চিন্তা, বিশ্বাস ও মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কোনো কিছু এখানে করতে যাওয়া ও করতে চাওয়া মানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া। একুশ শতকের গণতান্ত্রিক বিশ্বে এটা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না।

তাছাড়া একটা নিখাদ সত্য হলো, মুসলমানরা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে জবাই করার জন্য তাদের এই

স্বাধীন দেশটি কায়েম করেনি। একশো নব্বুই বছর ইংরেজের গোলামী করেছে বলেই তারা নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ত্যাগ করেনি। বরং এগুলোর বিকাশ, চর্চা ও পুনরগঠনের জন্যই এই স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এটাই সত্য। এটাই বাস্তবতা, এটাকে অস্বীকার করা মানে এর জাতিসত্তাকে একটা দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতে লিপ্ত করা। এর স্বাধীন সত্তাকে বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করা।

এই সঙ্গে আর একটা সত্য হলো, ইংরেজের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মুসলমানদের অনেক উপকার করার সাথে সাথে একটা বড় রকমের ক্ষতি করেছে এই যে তাদের ঈমানী দুর্বলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার মধ্যে সফলতার সন্ধান করে। ইসলাম প্রথম থেকেই জ্ঞান চর্চাকে কেবল উৎসাহিতই নয় বরং তার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীটি জ্ঞান চর্চার ইসলামী ধারার অনুসরণ না করে এবং তার সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা না চালিয়ে এমন পথ অবলম্বন করেছে যার ফলে মুসলমানরা জাতিগতভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এর একটা দৃষ্টান্ত হলো, ভাস্কর্যের নামে মূর্তিগড়ার প্রবণতা। বিশেষ করে এ গোষ্ঠীটির উদ্যোগে গত তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর থেকে এ প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোথাও শিল্প কলার এবং কোথাও জাতীয় স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার মানুষের মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। যেগুলো কুরআন ও হাদীসের বিধান ও ভাবধারার সুস্পষ্ট লংঘন এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নিছক সৌন্দর্য চর্চার উদ্দেশ্যে প্রাণীও মূর্তিগড়া হলেও আসলে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভাব জেগে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কালক্রমে এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভাব থেকে পূজার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। আর ইসলাম এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পূজা, উপাসনা, আরাধনা, বন্দনা ও ইবাদত করার কোনো অনুমতি দেয়নি। এটা সবচেয়ে বড় অপরাধ ও পাপ। সমস্ত অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু এ অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই বলে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

তাই মুসলিম ফকীহ ও আইনবেত্তাগণ একযোগে প্রাণীর মূর্তি গড়াকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে গত চৌদ্দশো বছরে মুসলমানদের মধ্যে এ প্রবণতা কোথাও জন্ম নিতে পারেনি। অতি সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে একটি অতি ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রবর্ণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা ইসলাম ও মুসলিম বৈরিতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে বাংলাদেশে মুসলিম জাতিসত্তার বিনাশে উদ্যোগী হয়েছে। এটা কোনো শিল্পকলা চর্চা নয় বরং মুসলমানদের ঈমানী সত্তাকে আঘাত হানার একটা অপকৌশল।

আমরা মনে করি এই ধরনের গোষ্ঠী ও অপশক্তিকে সহায়তা দেয়া কোনো দেশীয় ও জাতীয় সরকারের দায়িত্ব নয়।

- আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৯-৩২

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

॥ এক ॥

[মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা থেকেই নিয়ম ও শৃঙ্খলার উৎপত্তি। কারণ মানুষ বুদ্ধিমান জীব এবং বুদ্ধিমান জীব নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে তার পরিবার ও সমাজ অটুট রাখে, তাকে পরিচালনা করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। আইনের প্রয়োজন এখানেই। এ নিয়মই একটা আইন। শৃঙ্খলা এ আইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিগঠিত করে। তাই সভ্যতার সাথে আইন জড়িত এবং সভ্যতার জন্য আইন অপরিহার্য। এটা ভিন্ন কথা গ্রীক দেশ থেকে গ্রীক সভ্যতার মাধ্যমে আমরা প্রথমে আইনের কথা শুনে থাকি। নয়তো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহর নবীগণ যে মানব সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানেই পরিচালিত হয়েছে। কুরআনেই একথা বলা হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যখন দুনিয়াতে পাঠান প্রথম দিনেই তাকে বলে দেন, 'আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথ নির্দেশনা যাবে। যারা আমার পথ নির্দেশনা মেনে নেবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের কোনো মর্মজ্বালাও অনুভব করতে হবে না। আর যারা আমার নির্দেশ ও নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা মিথ্যা বলবে তারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকবে চিরকালের জন্য'। (আল বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

এ আইনের প্রয়োজনে এবং আইনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করার জন্য বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম যে বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। বছরের পর বছর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের শাসনকালে তার মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল বাংলা ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার'। ইনশাআল্লাহ তা ধারাবাহিকভাবে 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর পাতায় এ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকবে।] — সম্পাদক

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন

জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে হয়, মানুষের জ্ঞান আজও এ রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। নির্জীব বস্তুর নিছক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষ ঘটতে পারে না, এ পর্যন্ত এটিই সর্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাণ সৃষ্টির জন্য যতোগুলো উপাদানের প্রয়োজন সবগুলো যথাযথ আনুপাতিক হারে একেবারে আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে গিয়ে আপনাআপনি জীবনের উন্মেষ ঘটে যাওয়া অবশ্যই নাস্তিক্যবাদীদের একটি অ-বাস্তব কল্পনা। কিন্তু যদি অংক শাস্ত্রের আকস্মিক ঘটনা নিয়ম (Law of chance)-এর ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহের (Laboratories) নিস্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করার যতগুলো প্রচেষ্টাই চলেছে, সম্ভাব্য সবধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তার সবই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বড় জোর যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে কেবলমাত্র এমন বস্তু যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় DNA বলা হয়। এটি এমন বস্তু যা জীবিত প্রাণীর দেহ কোষসমূহে পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই জীবনের উপাদান কিন্তু নিজে জীবন্ত নয়। জীবন আজও একটি অলৌকিক ব্যাপার, এটি একজন স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল, এছাড়া এর আর কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

সৃষ্টির সূচনা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বই সর্বপ্রথম, তাঁর পূর্বে অথবা তাঁর সাথে অন্য কিছুই ছিল না। বুখারীতে অহীর সূচনা অধ্যায়ে সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে শুধু আল্লাহ ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। ইবনু হাজার 'আসকালানী (র) বলেন,

قوله (كان الله ولم يكن شئ غيره) وفى الرواية الا يتة فى التوحيد (ولم يكن شئ قبله) وفى رواية غير البخارى (ولم يكن شئ معه) والقصة متحد فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله صلي الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس (انت الأول فليس قبلك شئ) ولكن رواية الباب أصرح فى العدم ولا فيه دلالة على أنه خلق لم يكن شئ غيره لا الماء ولا العرش وغير هما لأن كل ذلك غير الله

تعالى ويكون قوله (وكان عرشه على الماء) معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش علي الماء وقد وقع فى قصة نافع بن زيدالحميري بلفظ (كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هوكائن ثم خلق السموات والأرض وما فيهن) فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش :

মহান আল্লাহ তা'আলা হলেন সর্বপ্রথম অস্তিত্ব। তিনি বাদে তাঁর সাথে অথবা তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না', সামনে কিতাবু তাওহীদের বর্ণনায় আসবে যে, 'তাঁর সাথে অন্য কিছু ছিল না', এখানে আলোচিত ঘটনা একই সূত্রে গাথা। সুতরাং বলা যায় যে, বর্ণনাটা অর্থগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত রাবী এ বর্ণনাটা রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামাযের দোয়া থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে আলোচিত হয়েছে, (আপনিই সর্বপ্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই নেই)। কিন্তু 'আল্লাহর' পূর্বে অন্যকিছুর অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কিত সহীহ আল-বুখারীর আলোচিত হাদীসের বর্ণনা অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা থেকে অধিক স্পষ্ট। তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 'আল্লাহ তা'আলার পূর্বে তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না'। না পানি, আর না 'আরশ, না অন্য কিছু। কেননা- অন্য সবকিছুই 'গায়রুল্লাহ', তাঁর বর্ণনা, "তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর' এর অর্থ হলো, তিনি পানিকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অতপর আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কিত 'নাফে' বিন যায়দ হুমাইরী'-এর বর্ণিত ভাষা হলো 'তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর, এর পরে 'কলম' সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ বলেছেন, অস্তিত্বশীল যা আছে তা লিখ, অতপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেন। এতে সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পরস্পরা বর্ণনা করা হয়েছে, যে সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে পানি ও 'আরশ সৃষ্টির পরে। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য হলো, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা প্রথমত পানি সৃষ্টি করে আরশ তার উপর স্থাপন করেন। অতপর আসমান, যমীন ও তার মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ হলো সৃষ্টিকর্তা একমাত্র একক আল্লাহ তা'আলা আর বাকী সবকিছুই হলো তাঁর সৃষ্টি।[১]

বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস

মহান আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা যেমন একক লা-শরীক, তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও তিনি অনন্য। তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নামসমূহের একটি হচ্ছে البد।

يع – কোনরূপ পূর্ব নমুনা ছাড়াই সম্পূর্ণ নতুনভাবে উদ্ভাবনকারী তিনি। যাঁর সৃষ্টি কর্মে কোনরূপ উপায়-উপকরণ বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। আল্লামা ইস্পাহানী লিখেছেন ঃ 'কোনরূপ পূর্ব নমুনার অনুকরণ অনুসরণ ছাড়াই উদ্ভাবন করাকে ইজাদ বলা হয়।' আর "بديع" শব্দটি যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন "البديع" শব্দের অর্থ হয় "সেই সত্তা যিনি কোন যন্ত্রপাতি, উপায়- উপকরণ, স্থান-কাল-পাত্রের অবলম্বন ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন"। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ.

'আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোনকিছু করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।'[২]

বিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলেই এর বিস্তারিত তত্ত্ব ও ইতিহাস পাওয়া যায়। কোন কোন আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পরে আকাশ মন্ডলী সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

'তিনি পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' (২ঃ২৯)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَه اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ. فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ

اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

"বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই? যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তাতে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মতো খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। অতপর তিনি আকাশমন্ডলের দিকে মনোনিবেশ করলেন, তা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। উভয়ই বললো, আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগত হয়ে। তখন তিনি আকাশ মন্ডলকে দুই দিনের মধ্যে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন এবং প্রতি আসমানে তার বিধি বিধান অহীর মাধ্যমে নাযিল করলেন। আর দুনিয়ার আসমানকে আমরা প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্নভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসব কিছু এক মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্তার ব্যবস্থাপনা।" (৪১ঃ৯-১২)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির উপকরণ ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিল। বিশ্ব জাহানের বর্তমান যে রূপ আছে আল্লাহ তাকে সেই রূপ দিতে চাইলেন। তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্ব জাহানের যে নকশা ছিল সে অনুসারে তাকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ছায়াপথ, তারকারাজি এবং গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন ঐসব উপকরণ যেন সেই আকৃতি ধারণ করে সেই নির্দেশ দান করলেন। সাথে সাথে ঐ সব উপকরণ সংকুচিত ও একত্রিত হয়ে অনুগত বান্দার মত প্রভুর পরিকল্পিত নকশানুযায়ী তৈরি হতে শুরু করে এবং ৪৮ ঘণ্টায় পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্ব জাহান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়। অতপর আল্লাহ তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন।

اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مِهدًا. وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا. وَّخَلَقْنكُمْ اَزْوَاجًا. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا. وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا. وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرتِ مَاءً ثَجَّاجًا. لِّنُخْرِجَ بِه حَبًّا وَّنَبَاتًا. وَّجَنّتٍ اَلْفَافًا.

'আমি কি তোমাদের জন্য ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক রূপে তৈরি করে দেইনি? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম এবং রাত্রিকে করেছি আবরণ স্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি, তদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান।' (৭৮ঃ৬-১৬)
তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِيْ الاَرْضِ جَمِيْعًا
'পৃথিবীর সবকিছুই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা বাকারা-২ঃ২৯)
অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِه اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন তা তিনিই সৃষ্টি করেন। জেনে রাখ, সৃজন ও শাসন তাঁরই। মহিমাময় বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)
এখানে ছয় দিনে সৃষ্টি সংক্রান্ত আয়াতসমূহের দিন (اليوم) শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ তা যে দুনিয়ার হিসাবের ২৪ ঘন্টার দিন নয় তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩]
এখানে প্রশ্ন আসে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেখানে (كُنْ) 'হও' বলামাত্র সব কিছু হয়ে যায়, সেখানে সৃষ্টি কার্যে এই ছয়দিন বা ছয়টি বিশাল মেয়াদকাল অতিবাহিত হলো কেন? হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের এ সম্পর্কে বলেন ঃ 'মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে নিসন্দেহে এক নিমিষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মসম্পৃক্ততা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।[৪]
মহান আল্লাহ তা'আলা পূর্ব নমুনা ছাড়াই আসমান যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুই দিনে ভূমন্ডল এবং দুইদিনে

পাহাড় পর্বত, সাগর-নদী, উদ্ভিদ, মানুষ, জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ ও জীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য।

মানব সভ্যতার গোড়া পত্তনে আদম আ.

নবী-রসূলগণ যেহেতু শিষ্টাচার ও মানবতার-পথ প্রদর্শনকারী আদর্শ সভ্যতারই পয়গাম বাহক, তাই আদম আ.-কে মানব সভ্যতার পথিকৃতরূপে অভিহিত করা হয়। হযরত আদম আ. একাধারে মানবজাতির আদি পিতা, এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত প্রথম খলীফা (প্রতিনিধি) এবং প্রথম নবী ও রসূল। মানব জাতির সূচনা এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমে সভ্যতারও সূচনা হয় তাঁর মাধ্যমে।

১। আদমের সাথে হাওয়াকে সৃষ্টি করে পারিবারিক জীবনের মাধ্যমে প্রথম সভ্যতার সূচনা হয় ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا.

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।" সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯

এখানে আমরা দেখি আল্লাহ এক ব্যক্তি আদম থেকে তাঁর স্ত্রীকে ও আমাদের সকলকে সৃষ্টি করে পারিবারিক জীবনের মাধ্যমে গোটা মানবজাতির শান্তিপূর্ণ সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছেন।

২। আদম সৃষ্টির মাধ্যমে মানব জাতির পারস্পরিক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন হতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন। তোমরা সেই প্রতিপালককে ভয় কর যার নামে দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে নিজের অধিকার দাবি কর।

এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"[৫] (সুরা নিসা-আয়াত-৯) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পারস্পরিক সামাজিক জীবন ভিত্তিক সভ্যতার সূচনা আদম ও হাওয়া থেকে শুরু করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

৩। আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন মানব জাতির মধ্যে পরস্পর পরিচিতি লাভ করে ঐক্যবদ্ধ সভ্যতার আদর্শ স্থাপনের জন্য বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍوَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَا ئِلَ لِتَعَارَفُوْا.

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।' (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

সুতরাং দুনিয়ায় মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন যে একই ব্যক্তি ও এক অভিন্ন দম্পতি হতে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং মানবজাতির আদি পিতা আদম আ. তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এ কথা প্রমাণিত সত্য যে মানব সভ্যতার গোড়পত্তন হয়েছে, আদম আ.-এর সৃষ্টি থেকেই।

আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব সভ্যতা

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এ বিশ্বজাহানে তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করার জন্য প্রথমত জ্বিন জাতিকে পরে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُوْنَ.

'আমি জ্বিন জাতি ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি' (সূরা, আয্‌যারীয়াত, আয়াত ৫৬). উক্ত ইবাদত হলো মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সব কিছু পরিচালনা করা, আর উক্ত ইবাদত কার্যকরী করার জন্য মানুষের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা তদারককারী নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই তদারককারীদের দায়িত্বই হলো স্বয়ং আল্লাহর প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করা। এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً.

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' (সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারী বলেন, এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ আল্লাহ ঘোষণা করছেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবো।' ইবনে আব্বাস বলেন, 'পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দা ছিল জ্বিন জাতি। তারা এখানে ফিতনা-ফাসাদ, হানাহানি ও খুন- খারাবী করে সীমা লঙ্ঘন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একটি বাহিনীসহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলীস ও তাদের সাথী ফেরেশতাগণ তাদেরকে হত্যা করলো এবং বিভিন্ন সাগরের দ্বীপে ও পাহাড় পর্বতে তাড়িয়ে দিল। অতপর আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে মানব জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন।' সে হিসেবে উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, 'আমি পৃথিবীতে জ্বিন জাতির স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করবো–যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করবে ও তা আবাদ করবে।' ইবনে মাস'উদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ খলীফার প্রকৃতি কি হবে ফেরেশতাগণের এরূপ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তার কতক সন্তান এমনও হবে যারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি খুনাখুনিতে লিপ্ত হবে।[৫]

উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, 'আমি পৃথিবীতে আমার মাখলুক সমূহের মাঝে আইন পরিচালনার্থে আমার খলীফা নিয়োগ করবো। সে খলীফা হবে আদম ও তাঁর সেসব সন্তানরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে ও আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। তবে ফাসাদ সৃষ্টি ও অন্যায় কার্যাদি সংঘটিত হবে খলীফা ছাড়া অন্য আদম সন্তানদের দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ খলীফার বংশধরদের মধ্যকার একটি অংশ ফিতনা ফাসাদ, বিদ্বেষ, হানাহানি ও খুনাখুনিতে লিপ্ত হবে। এখানে লক্ষণীয়, এ জবাবে ফিতনা-ফাসাদ. হানাহানির সাথে খলীফার বংশধরদের একাংশকেই কেবল সম্পৃক্ত করা হয়েছে, স্বয়ং খলীফাকে বা তার সৎকর্মশীল বংশধরগণকে এই অপবাদ হতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত রেখেছেন।[৬]

প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. বলেন, "যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ব্যবহার

করে তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন তাই সে ক্ষমতার ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছা পূরণ করাই তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।[৭] মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্বশীল করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাসসিরে কুরআন সাইয়েদ কুতুব শহীদ র. বলেন ঃ

'অর্থাৎ যখন মহান আল্লাহ তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছা অনুযায়ী এই নতুন সৃষ্টির হাতে পৃথিবীর দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তখন তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের হাতকে ক্ষমতাশালী করে দিয়েছেন। তার কাছে ন্যস্ত করেছেন নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ ও সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান শক্তি ও খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন এবং গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আপন অনুগত করার খোদায়ী ইচ্ছার বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা। এটাই ছিল আল্লাহ কর্তৃক তার কাছে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।' আর আল্লাহ মানুষকে সকল সুপ্ত শক্তি যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করলেন যাতে সে পৃথিবীর শক্তিকে এবং সকল খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামালকে ব্যবহার করতে পারে। আর আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিতে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রয়োজন, তাও তাকে দিলেন। 'আর পৃথিবী ও গোটা সৃষ্টি জগতকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তি এবং এই নতুন সৃষ্টিকে (মানুষকে) এবং তার শক্তি ও ক্ষমতাকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সাজুয্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে সংঘাত না বেধে যায় এবং এই বিশাল বিশ্বে মানুষের শক্তি ধ্বংস হয়ে না যায়।' তখন মানুষ অর্জন করলো এক সুমহান মর্যাদা। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ হয়ে দাঁড়ালো এক পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি।

এসবই হলো মহান আল্লাহর, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলিফা পাঠাতে মনস্থ করেছি' এ উক্তির কিছু ব্যাখ্যা। সচেতন বোধ ও উদার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এবং এই

নতুন সৃষ্ট প্রতিনিধির হাতে এই বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এ উক্তির উল্লেখিত ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।[৮]

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়ার কোন সভ্যতাই মানুষ জাতিকে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মত এমন সুমহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেনি। একমাত্র ইসলামই মানব জাতিকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে দায়িত্বশীল করে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

মানব জাতির জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মানব জাতিকে তাঁরই আনুগত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রষ্ঠিতার লক্ষে আদম আ.-কে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতপর তিনি তাকে সমুদয় ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন ঃ এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩১)

এখানে كُلَّهَا শব্দ সম্পর্কে জানা যায় যে, এই জ্ঞান আংশিক ছিল না, বরং ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য তা ছিল পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানভান্ডার। মানুষকে এই দুনিয়ায় যে সকল জিনিসের সম্মুখীন হওয়ার ছিল তার সব কিছুর নাম তাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। নাম শিখিয়ে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, বরং তার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা, ক্ষতি, ব্যবহারের পন্থা এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরনও পূর্ণরূপে জ্ঞাত করা হয়েছিল। মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষ তার মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণা-অনুসন্ধানের গঠন প্রকৃতির সাহায্যে জিনিসসমূহের জ্ঞানের পরিসর ব্যাপক ও প্রশস্ত করতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত চালু থাকবে। এ ক্ষেত্রে অন্য যাবতীয় সৃষ্টির উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় সমাসীন করা হয়েছে। এমনকি ফেরেশতাদেরকে উল্লেখিত জিনিসসমূহের নাম বলে দেয়ার জন্য বলা হলে তারা জবাবে বলেছিলেন ঃ

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ.

'তারা বললো, আপনি মহান, পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের তো অন্য কোন জ্ঞান নেই। আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩২)

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম আ.-কে সকল বিষয়ের নাম শিক্ষা দেয়া সংক্রান্ত উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী র. লিখেছেন ঃ

'কোন বস্তুর নামের সাহায্যে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে, এটাই মানুষের জ্ঞান লাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্য-জ্ঞান মূলত জিনিসের নামের সাথে জড়িত। তাই আদম আ.-কে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেয়ার অর্থই ছিল–তাঁকে সমস্ত জিনিসের জ্ঞান (শিক্ষা) দান করা হয়েছিল।'[৯]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ 'পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক পরিচয় ও লক্ষ্যণাদি এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।[১০]

আল্লামা বায়যাবী র. বলেন, 'তিনি তাঁকে বস্তুসমূহের নাম, সত্তা, গুণাবলী, ধর্ম, সেই সাথে যাবতীয় জ্ঞানের সূত্র ও নীতিমালা এবং প্রযুক্তির নিয়ম কানুন ও এগুলোর উপকরণাদির ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।' ইমাম রাযী র. তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতিটি বস্তুর বিবরণ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানদান করেন।'

আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নামসমূহের দ্বারা মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'এ পর্যায়ে আমরা যেন অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, যা ফেরেশতারা দেখেছিলেন, আদম আ.-কে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ কালে যে গুপ্তরত্ন ভান্ডার আল্লাহ মানুষকে দিয়েছিলেন তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। সে জিনিসটা হচ্ছে নাম দ্বারা নির্দিষ্ট জিনিসকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা, ব্যক্তি ও বস্তুর নামকরণের ক্ষমতা এবং সেই নামকে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর সংকেত চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। মানুষ এভাবে নামকে জিনিসের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করতে না পারলে কিরূপ জটিলতা দেখা দিত তা কল্পনা করলেই এই ক্ষমতার মূল্য কত তা আমরা বুঝতে পারি। পারস্পরিক লেন-দেন ও মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কী দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তা একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন একটি জিনিস সম্পর্কে দুজনে

আলোচনা করতে চাইলে ঐ জিনিসটা তাদের সামনে হাজির করতে হতো। নচেৎ পুরো কথাটা দুর্বোধ্য থেকে যেতো। মনে করুন, একটা পাহাড় সম্পর্কে কথা বলতে হলে বক্তা ও শ্রোতাকে সশরীরে সোজা পাহাড়ের নিকট চলে যেতে হতো। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা বলতে হলে সেই ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করতে হতো। 'এভাবে এ সমস্যা এত কঠিন আকার ধারণ করতো যে, আল্লাহ মানুষকে নাম ব্যবহারের শিক্ষা ও ক্ষমতা না দিলে তাদের গোটা জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠতো।'[১১] সুতরাং 'আদম আ.-এর জ্ঞান কেবল বস্তুসমূহের নামের জ্ঞান ছিল না, ছিল ব্যাপক জ্ঞান- যা এই মহাবিশ্বে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য ছিল।[১২]

বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার কি তার পূর্ণ চেতনা ও অপরিহার্যরূপে উক্ত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষ কেবল নিজের ধারণা-অনুমান অথবা সংগার ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহ নির্ধারিত ও অর্পিত বিধানের কারণেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করেছে। আদম আ.-কে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'কাসাসুল কুরআন' প্রণেতা মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারী বলেন, 'ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট আদম সৃষ্টির ব্যাপারে যে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তার মাঝে আদমকে হেয় প্রতিপন্ন করার আভাস ছিল, ফলে আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে জবাব দেন যাতে ফেরেশতারা শুধু আদমের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করেনি, বরং নিজেদের দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছিল, যেহেতু মহা প্রজ্ঞাশীল আল্লাহর নৈকট্য তারা প্রত্যক্ষ করেছিল। যেহেতু মহা প্রজ্ঞাশীল আল্লাহর নৈকট্যে তারা ছিলেন তাই তৎক্ষণাৎ তারা বুঝে নিলেন যে, তাদের প্রতি আল্লাহর প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা নয়, বরং এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, আল্লাহর খিলাফতের যোগ্যতা আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম বর্ণনার আধিক্যের উপর নয় বরং ইলম-এর উপর নির্ভরশীল। কেননা বিশ্ব পরিচালনা ইলম ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে পরিপূর্ণ ইলম-এর অধিকারী করেছেন তখন নিসন্দেহে তিনিই দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্বের অধিক যোগ্য। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে তারা দুনিয়ার সমস্ত কামনা ও রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই। আর আদমকে যেহেতু এ সকল ব্যাপারে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে তাই এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা তার জন্য একটি স্বাভাবিক ও আবশ্যিক ঘটনা। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রকৃতই ঐ সমস্ত

জিনিসের জ্ঞানদান করেছিলেন এবং তার জন্য যা কিছু জানার প্রয়োজন ছিল তার সব কিছুই তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এক কথায় আদম আ.-কে জ্ঞান নামক গুণ দ্বারা গুণান্বিত করায় ফেরেশতারা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর খেলাফতের যোগ্যতা স্বীকার করে নিতে। তাঁরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, যদি আমাদেরকে আল্লাহর খলীফা করা হতো তাহলে বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারতাম না। আমাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। তাই আমরা জমির নীচে সংরক্ষিত রিযিক ও ধন ভান্ডারের অন্বেষণ করতাম না। আমাদের ডুবে যাওয়ার আশংকা নেই। তাই আমরা বিভিন্ন প্রকারের নৌযান উদ্ভাবন করতাম না। আমাদের রোগ-ব্যাধির আশংকা নেই তাই বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, বস্তুগত জ্ঞান প্রভৃতি অগণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতাম না। এগুলো শুধু মহান সৃষ্টি মানবের জন্যেই। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হবে এবং ঐ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রহস্যাদি আয়ত্ত করে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবে এবং অধিকারসমূহ সঠিকভাবে ভোগ করবে।'

আদম ও হাওয়া আ.-কে শয়তানের ধোকাবাজির বিচার

আদম আ.-কে সৃষ্টির সূচনা হতেই ইবলিস তাঁর প্রতি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছিল। তার সম্মুখে আদমের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহর প্রতি-নিধিত্বের যোগ্যতার মহাসত্যটি উদঘাটিত হলো না। তাই আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথেই যেখানে ফেরেশতাগণ সিজদায় পড়ে গেলেন, ইবলিস তখন তার অহংকারের পথে ধাবিত হলো। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় আমরা তার অবস্থান জানতে পারি ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ، اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

'যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো, সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো, সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' (**সূরা বাকারা-আয়াত ৩৪**)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ.

'তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম কী সে তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বললো, আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন, এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১২-১৩)।
অন্যত্র আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ. اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ يٰاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلاَّ تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ لَمْ اَكُنْ لاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَه مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ.

'তখন ফিরেশতাগণ সকলে একত্রে সিজদা করলো, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো। আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? সে বললো, আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা হতে যে সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজদা করতে পারি না। তিনি বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও; কারণ তুমি তো অভিশপ্ত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি লা'নত বর্ষিত হবে।' (সূরা হিজর, আয়াত ঃ ৩০-৩৪)।
এভাবেই মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আযাযীলের দীর্ঘকালের ইবাদত-বন্দেগী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্ম অহংকারে অন্ধ হয়ে মানবজাতির চরম শত্রু হয়ে গেল। সে ঘোষণা করলো ঃ

قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ. ثُمَّ لاٰتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ

اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

'সে (ইবলিস) বললো, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বললো, আপনি আমাকে শাস্তি দান করলেন, এ জন্য আমিও আপনার সরল পথে মানুষকে (বিভ্রান্ত করার জন্য) ওঁৎ পেতে থাকবো। তারপর আমি তাদের নিকট আসবোই, তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি বললেন, এ স্থান হতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। মানুষের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি (তাদেরসহ) তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪-১৮)

ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা ও দম্ভোক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.

'বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্যই জাহান্নাম তোমাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান। এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে। আর অবশ্যই, মুত্তাকীগণ জান্নাতে অবস্থান করবে। (সূরা হিজর, আয়াত- ৪২-৪৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে অবস্থার ও পরীক্ষার এবং শত্রুতার সম্মুখিন হতে হবে তার বাস্তবতা উপলব্ধি করে উক্ত পরীক্ষায় সফলতার জন্য করণীয় বুঝাবার জন্য আদম (আ)-কে জান্নাতে রেখে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, আল্লাহ বলেন,

وَقُلْنَا يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.

'এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।' (সূরা বাকারা আয়াত ঃ ৩৫) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, 'সুদ্দী' হযরত ইবন আব্বাস রা. ও অনেক সাহাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইবলিস জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আদম আ.-কে জান্নাতে বসবাস করতে দেয়া হয়। তিনি তখন জান্নাতে একাকী ঘোরাফেরা করতেন, তাঁর সাথে বসবাসের জন্য তার কোন স্ত্রী ছিলেন না, একদিন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তার শিয়রে একজন নারী উপস্থিত, যাকে–আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাম পাঁজর হতে সৃষ্টি করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? হাওয়া বললেন, আমি স্ত্রীলোক। আদম বললেন, তুমি কেন সৃষ্টি হয়েছো? হাওয়া বললেন, যাতে আপনি আমার সাথে বসবাস করেন এবং শান্তি লাভ করেন।[১৩]

এবার আদমের পরীক্ষা শুরু হলো, আল্লাহ নির্দেশ দিলেন

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَاتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

'এবং যেখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৩৫)।

ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহীদ র. বলেন, 'সম্ভবত ঐ গাছটিকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর জান্নাতে কিছু নিষিদ্ধ বস্তুর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'কিছু জিনিস নিষিদ্ধ না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায় না, এবং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানুষকে ইচ্ছা শক্তিহীন পশু পাখী থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষ কতটা ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও বিধি নিষেধ মেনে চলতে পারে তার পরীক্ষা নিষিদ্ধ জিনিস ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতাই হলো মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি। যাদের ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বাছ বিছার করার ক্ষমতা নেই। নির্বিচার জীবন যাপন করে। তারা দেখতে মানুষ হলেও আসলে পশু।'[১৪]

আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে জান্নাতে থাকার অনুমতি দিয়ে সেখানকার অবস্থাও বলে দিলেন ঃ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى.

'তোমার জন্যে নির্ধারিত করলাম যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না, নগ্নও হবে না, সেখানে পিপাসার্তও হবে না, রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না)।' (সূরা ত্বাহা, আয়াত ১১৮-১১৯)

মহান রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি বিধানের পথে আদম আ.-এর জন্য ইবলিস যে প্রধান শত্রু, তা বুঝাবার জন্য আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

يَا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُ وٌّلَّكَ وَلِزَ وْجِكَ فَلاَ يُخْرِ بَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقى.

'হে আদম! নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করে না দেয়। বের করে দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে।' (সূরা ত্বাহা আয়াত ১১৭)

অতঃপর জান্নাতে আদম ও হাওয়া আ.-এর প্রতি শয়তানের ধোকাবাজী ও তার অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَ سْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلى.

'অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে জীবন প্রদ বৃক্ষের কথা, অক্ষয় রাজ্যের কথা বলে দিব না?' (সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২০)

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذهِ الشَّجَرَةِ الاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ . وَقَاسَمَهُمَا انِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَكُمَا انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُ وٌّ مُّبِيْنٌ.

'পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করলো। তারা যখন উভয়ে উক্ত বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো

এবং তারা জান্নাতের পত্র পল্লব দ্বারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করিনি? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?' (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ২০-২২)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইদরীস কান্দালভী তখনকার আদম ও শয়তানের মধ্যকার কথাবার্তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হযরত আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে কোন বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য বলছো? জবাবে শয়তান তাঁকে সেই বৃক্ষের কথা বললো, যার নিকট যেতে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি বললেন যে, এটা তো নশ্বরত্ব ও পতনের বৃক্ষ। অবিনশ্বরতা ও অমরত্বের বৃক্ষ নয় বরং এ হচ্ছে অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার বৃক্ষ। আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর দরবারে সম্মান বৃদ্ধির পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি ও অপদস্থ হওয়ার হেতু। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। এ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় তোমার কথিত ফায়দাসমূহ নিহিত থাকলে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই আমাদেরকে বারণ করতেন না।" জবাবে শয়তান বললো, তোমাদের রব তোমাদের ক্ষতি হবে ভেবে এর ফল খেতে বারণ করেননি, বরং তোমরা যাতে চির অমর অথবা ফেরেশতায় পরিণত না হও এ জন্যই তিনি তোমাদেরকে তা খেতে নিষেধ করেছেন, যাদের না আছে পানাহারের দুশ্চিন্তা আর না আছে স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা। তোমরাও যদি তা হয়ে যাও তাহলে খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কী করে পালিত হবে? পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্ব তো স্ত্রী-পুত্র পরিজন, পানাহার ও আয়-উপার্জনের ব্যস্ততার মাধ্যমেই পালন করতে হবে। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী কখন হবে? তোমাদের দ্বারা খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করানোর জন্যই দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণে যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভ ঘটে, তাই তোমাদেরকে তা হতে বিরত রাখা হচ্ছে। অধিকন্তু বেহেশতে কোন মৃত্যু নেই। তোমেরদেকে কেবল খিলাফতের রীতি-নীতি শিক্ষা দেয়ার জন্যই অস্থায়ীভাবে কিছু দিন বেহেশতে বসবাসের আদেশ দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি তার নৈকট্য হতে দূরে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। সেখানে গিয়ে তোমাদেরও তোমাদের সন্তান সন্ততির নানা রূপ ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হবে। অবশেষে সকলেরই মৃত্যু হবে। পৃথিবীতে যাওয়ার ও খিলাফত লাভের পর আল্লাহ তা'আলার এই নৈকট্য আর তোমাদের ভাগ্যে জুটবে না।[১৫]

ইবলিসের হিংসা ও বিদ্বেষের মোকাবিলায় তার কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার পরীক্ষায় আদম ও হাওয়া যেভাবে পরাজয়ের শিকার হন তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى.

'যখন তারা উভয়ে উক্ত বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, সে ভ্রমে পতিত হলো।'(সূরা ত্বাহা:-১২১)।

হাবীল ও কাবীলের মধ্যে প্রথম নর-হত্যার বিচার ফয়সালা

মানব সভ্যতার প্রথম হানাহানি ও ভ্রাতৃ-হত্যার ঘটনাই ছিল হাবীল ও কাবীলের মধ্যে নর-হত্যার ঘটনা। আদম ও হাওয়ার যৌন মিলনে প্রতিবারেই তাদের দু'জন করে সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। তাদের একজন পুত্র ও অন্য জন কন্যা। এ ঘটনার প্রতি ইশারা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ. لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّىْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْۤءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰۤؤُا الظّٰلِمِيْنَ. فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ.

'আদমের দু'পুত্রের ঘটনা আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো আর অন্য জনেরটা কবুল হলো না। তাদের একজন বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবোই। অপর জন বললো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না; আমি তো

জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করো এবং জাহান্নামবাসী হও এটাই আমি চাই এবং এটাই জালিমদের কর্মফল।' অতপর তার প্রবৃত্তি ভ্রাতৃ হত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো এবং সে তাকে হত্যা করলো; ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে দাফন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগলো। সে বললো, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ দাফন করতে পারি? অতপর সে অনুতপ্ত হলো।' (সূরা মায়েদা ঃ ২৭-৩১)।

যখন আদম ও হাওয়ার থেকে যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করতে থাকে তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম আ.-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারী করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ কারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত (ابْنَىْ آدَمَ)-এর অর্থ সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবীল ও কাবীলকে বুঝানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে কাবীলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবীলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিয়ের সময় হলে আদম আ.-এর প্রতি নির্ধারিত শরীয়ত অনুযায়ী হাবীলের সহজাত কুশ্রী ভগিনীটি কাবীলের ভাগে পড়লো। এতে কাবীল ক্ষিপ্ত হয়ে হাবীলের শত্রু হয়ে গেলো। সে জিদ ধরলো যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সাথে বিয়ে দিতে হবে। আদম আ. শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতপর তিনি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করার জন্য বললেন, 'তোমরা উভয়েই আল্লাহর সমীপে নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী কবুল করা হবে তার সাথেই উক্ত কন্যার বিয়ে দেয়া হবে।' আদম আ. নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, যে সৎপথে আছে তার কুরবানীই কবুল করা হবে।

তৎকালে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল, আকাশ থেকে একটি অগ্নি শিখা এসে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী ভস্মীভূত হত না তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো। হাবীল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশুপালন

করতো। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করলো। কাবীল কৃষি কাজ করতো। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্যে পেশ করলো। অতপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানী ভস্মীভুত করে দিল এবং কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইলো। কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ না করে প্রকাশ্যেই তার ভাইকে বলে দিল (لَأَقْتُلَنَّكَ) আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো।'
হাবীল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করলো। সে বললো ঃ

إنما يتقبل الله من المتقين –

'আল্লাহ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি পরহেজগারের কুরবানীই গ্রহণ করেন।' তুমি তা অবলম্বন করলে তোমার কুরবানী গৃহীত হতো। তুমি তা করনি তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি? [১৬]
এক্ষেত্রে হাবীলের যেহেতু কোন অপরাধ ছিল না, তাই তিনি পাল্টা রাগ করে তার চেয়ে দুর্বলতর প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পিতৃভক্ত, সচ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত সংযতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় কুরবানী কবুল হওয়া না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে ভাইকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। পরোক্ষভাবে ভাইকে আল্লাহ ভীতি অবলম্বনের আহ্বান জানালেন। কিন্তু কাবীলের জিদ আরও বৃদ্ধি পেলো। অগত্যা হাবীল তার ভায়ের এই সীমালংঘন ও তার প্রাণ সংহারী প্রচেষ্টার মুখেও চরম ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিলেন। নিজের সংকল্পও ঘোষণা করলেন। কিন্তু এতসব উপদেশ সত্ত্বেও কাবীলের পাপীমন টললো না। সে তার সংকল্পে অটল থাকলো। হাবীল সর্বশেষে তাকে জাহান্নামের শাস্তির কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারপরেও কাবীল নিবৃত্ত হলো না। 'অতপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ হত্যায় তাকে প্ররোচিত করলো, ফলে সে তাকে হত্যা করলো। তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। সে ক্ষতির পরিমাণ যে কত ব্যাপক হযরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদীসে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে, এভাবে –

قال رسول الله (ص) لاتقتل نفس ظلما إلاكان على ابن ادم الأول من سن القتل–

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ 'অন্যায়ভাবে নিহত প্রত্যেকটি ব্যক্তির একটি দায়ভাগ আদমের প্রথম সন্তানটির উপর বর্তায়। কেননা হত্যার রীতি সেই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেছিল।[১৭]

উক্ত হত্যার বিচার ফয়সালার নীতি নির্ধারণী নির্দেশ নাযিল করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا.

'নর হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো।' (সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ র.-এর বরাতে আল্লামা ইবনে কাসীর র. বলেন, ভ্রাতৃ হত্যার দিনই কাবীলকে তাৎক্ষণিকভাবে তার শাস্তি দেয়া হয়। তার পায়ের নলাকে তার উরুর সাথে সংলগ্ন করে দেয়া হয়, তার মুখমন্ডলকে সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, সূর্য যে দিকে আবর্তিত হতো তার মুখমন্ডলকে সেদিকেই ঘুরিয়ে দেয়া হতো। এটা ছিল তার পাপের আশু ফলস্বরূপ এবং তার বিদ্রোহ ও আপন ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি।' রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আখেরাতের প্রাপ্য শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ার ত্বরিৎ শাস্তি লাভের জন্য বিদ্রোহ ও নিকট আত্মীয়তা সম্পর্ক ছেদনের মত পাপ আর হয় না।'[১৮]

মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে আদম আ. দুনিয়ায় এসে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য কার্যকরী করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ কাজে প্রধান শত্রু ও কঠিন প্রতিবন্ধক হিসেবে শয়তান মানব জাতির বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয়। আদম আ.-এর জীবনেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়ে এবং তার দু'পুত্র-হাবীল ও কাবীলের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী সৃষ্টি করে এবং হত্যার ঘটনা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শয়তান হলো মানবজাতির প্রধান শত্রু।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবনু হাজার 'আসকালানী, ফাতহুলবারী, শারহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল মারেফ, বৈরুত, লেবানন, কিতাবু বাদইল খাল্ক; ৬/২৮৯।
২. রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কুরআন, ব্যাখ্যা ঃ সূরা বাকারা ঃ ১১৭।
৩. আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা প্রকাশ ১৯৯৩, সূরা আ'রাফঃ৫৪৯ আয়াতের টিকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৩৪।
৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ) তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন' সংক্ষেপিত, পৃ. ৪৪৫।
৫. সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

৬. তাফসীর তাবারী, খন্ড ১, পৃ.--- সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭. তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতের 'খলিফা' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, সূরা বাকারার ৩০তম আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ঃ খ-১, পৃ. ১০৬।

৯. তাফহীমুল কুরআন, বাংলা অনু., আবদুল মান্নান তালিব, খঃ১, পৃ. ৬৩ টীকা ঃ ৪২।

১০. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, সূরা বাকারার ৩১তম আয়াত, দ্রষ্টব্য।

১১. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, খ ঃ ১ পৃ. ১০৫-১০৬, বাংলা অনু. সূরা বাকারার ৩০-৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২. তাফসীরে উসমানী, খঃ ১, পৃ. ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য।

১৩. তাফসীর ইবনে কাসীর, সংক্ষিপ্ত, মুহাম্মদ আলী সাবুনী সম্পাদিত, খ.১, পৃ. ৫৪।

১৪. কাসাসুল কুরআন, খঃ ১, পৃ. ১৮-২১, ইফাবা প্রকাশিত ও সংক্ষিপ্ত।

১৫. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, খ. ১, পৃ. ১০৯।

১৬. মা'আরিফুল কুরআন, কান্দালভী, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৭. মুসনাদে আহমদ ১/৩৮৩।

১৮. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/৮৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩-৪২

ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মুহাম্মদ মূসা

॥ তিন ॥

মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ

আঘাতের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতিসাধন সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ দেহের স্থানভেদে বিভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। যেমন কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধনকে 'ইতলাফে উদবু' (অঙ্গহানি), কোন অঙ্গের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করাকে 'ইতলাফে সালাহিয়াতে উদবু' (অঙ্গের কর্মক্ষমতা বিলুপ্তি) এবং মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতকে 'শিজায' বলে। আঘাত করা বা আহত করাকে বলে 'জুরূহ' (আঘাত)। আর মানবদেহের ক্ষতিসাধন সংশ্লিষ্ট অপরাধকে বলে 'আল-জিনায়াত'।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করা যেমন হাত বা পা কর্তন করা বা ভেঙ্গে ফেলা, কান কেটে ফেলা, চোখ উৎপাটন করা, আঙ্গুল ভেঙ্গে বা কেটে ফেলা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করা, যেমন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চলৎশক্তি, স্মৃতিশক্তি, যৌনশক্তি, ঘ্রাণ শক্তি ইত্যাদি নষ্ট করা। হাত আছে, পা আছে কিন্তু তার কর্মক্ষমতা লোপ পেয়েছে। চোখ আছে কিন্তু তার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছে।

ইসলামী আইনে মানব জীবনের মত মানবদেহের এবং তার সৌন্দর্যবর্ধক ও কর্মক্ষম প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুরুত্বও অপরিসীম। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আমাদের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিতে প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হয়; তদ্রূপ এগুলো আমাদের দৈহিক সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বাঙ্গীন সুন্দর কাঠামোয়।'[১]

অতএব কেউ তার এই সুন্দরতম কাঠামোকে বিকৃত বা ক্ষতি করার অধিকার রাখে না এবং অপর কাউকেও তা বিকৃত বা ক্ষতি করার অধিকার দেয়া হয়নি। এক কথায় মানুষ তার নিজ দেহের মালিক নয়, তার দায়িত্ব কেবল দেহের পরিপুষ্টি সাধন, এর সুস্থতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং একে প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করা।

লেখক ঃ গবেষক, গ্রন্থকার। একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ.

'আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।'[২]

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি

বাংলাদেশে বলবৎ দণ্ডবিধিতে মানবদেহের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত অপরাধসমূহের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারা থেকে ৩৩৮ (ক) ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে ও উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃত আঘাত (জুরহ) সম্পর্কে বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন সংশ্লিষ্ট অপরাধটি ইসলামী আইনে যতটা গুরুতর বলে বিবেচিত হয়েছে, বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে তা খুবই হালকা বিবেচিত হয়েছে। শাস্তির মাত্রা থেকেই তা অনুমান করা যায়। যেমন ঃ

৩২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কেউ স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করলে তার শাস্তি এক বছরের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা একত্রে উভয় দণ্ড হতে পারে। ৩২৫ নং ধারায় গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত বছর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ডও হতে পারে। ৩২৬ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, অপরাধী স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তির চোখ উৎপাটন করলে বা কোন পদার্থ দ্বারা চোখের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করলে এবং মুখমণ্ডল বা মাথা বিকৃত করলে অবস্থাভেদে বিচারকের সুবিবেচনামতে অপরাধী মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং আর্থিক জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত হবে। উল্লেখ্য যে, এই অপরাধে ইসলামী আইন মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে না, যদি না এরূপ আঘাতে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে (সস্থানে বিধান বর্ণিত হবে)।[৩]

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে বর্ণিত মানবদেহের ক্ষতি সাধন সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে অপরাধীর সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড এবং এতদসহ অর্থদণ্ডও হতে পারে। ইসলামী দণ্ডবিধিতে যেভাবে মানবদেহের ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি যেরূপ সুনির্দিষ্টভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে, বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে তা সেভাবে বর্ণিত নাই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধের প্রকৃতি, উপকরণ ও মাত্রা অনুপাতে শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি বিচারকের সুবিবেচনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আরো একটি বিষয় এই যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে যতখানি গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশের, ভারতের ও পাকিস্তানের দণ্ডবিধিতে তা ততখানি গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি।

ইসলামী দণ্ডবিধি

মানবজীবন ও মানবদেহ সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও তার শাস্তি সংক্রান্ত বিধান 'কিসাস' (সমান প্রতিশোধ) বিধির আওতায় আলোচিত হয়েছে। কিসাস-এর ভিত্তি হলো আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ.

'যদি তোমরা শাস্তি দিতে চাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দাও যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই উত্তম।'[৪]

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ.

'কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সম-পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করলে এবং সে পুনরায় নিপীড়িত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।'[৫]

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

'অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীগণের সাথে আছেন।'[৬]

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত অপরাধসমূহও কিসাস-এর আওতাভুক্ত। এই বিষয় সংক্রান্ত শাস্তির ভিত্তি নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

'আর আমি তাদের (ইহুদী-খৃষ্টান) জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই গুনাহ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা

ফয়সালা করে না তারাই যালেম।'[৭]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যতটুকু ক্ষতিসাধন করা হবে, ঠিক ততটুকু ক্ষতি সাধনের পূর্ণ অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে দান করা হয়েছে। প্রতিটি আসমানী ধর্মের বিধান এটাই। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (তাওয়াত)-এর অনুসারী ইহূদীদের জন্যও এই বিধান, বাইবেলের পুরাতন নিয়মসহ নতুন নিয়ম (ইনজীল)-এর অনুসারী খৃস্টানদের জন্যও এই বিধান এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব (আল-কুরআন)-এর অনুসারী মুসলমানদের জন্যও এই একই বিধান। বাইবেলে নিম্নোক্ত বাক্যে উপরোক্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ

'কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই পরিশোধ দিতে হবে ঃ প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দণ্ডের পরিশোধে দণ্ড, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা।"[৮]

দুঃখজনক দুর্ঘটনা

ইহূদীরা তাদের কিতাবের অলংঘনীয় বিধান ত্যাগ করে যেমন বিপথগামী অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে, তদ্রূপ খৃস্টানরাও একই অলংঘনীয় বিধান ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষকেও, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আজ মুসলিম দেশসমূহের কোথায়ও উপরোক্ত বিধান কার্যকর নেই। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী খৃস্টান শক্তিই দায়ী। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরাই মুসলমানদেরকে সর্বাধিক বিপথগামী করেছে। অন্যথায় তাদের কিতাবের বহু বিধান ইসলামের বহু মৌলিক বিধানের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, আল-কুরআনে শূকরের গোশত ভক্ষণ যেমন হারাম (চরমভাবে নিষিদ্ধ), তদ্রূপ বাইবেলেও তা হারাম।[৯] আল-কুরআনে যেমন সুদ হারাম, তদ্রূপ বাইবেলেও সুদকে হারাম করা হয়েছে।[১০]

অথচ এই ইহূদী-খৃস্টানরাই বিশ্বব্যাপী সুদের ব্যবসাকে সকল জাতির মধ্যে সম্প্রসারিত করেছে। পুরুষের জন্য নারীর পোশাক এবং নারীর জন্য পুরুষের পোশাক পরিধানকে রসূলুল্লাহ স. যেমন নিষিদ্ধ করেছেন, তদ্রূপ বাইবেল ও তার অনুসারীদের জন্য তা নিষিদ্ধ করেছে।[১১] রসূলুল্লাহ স. মুসলমানদের জন্য জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ যেমন নিষিদ্ধ করেছেন; তদ্রূপ বাইবেলও তার অনুসারীদের জন্য এগুলোর প্রতিকৃতি নির্মাণ হারাম করেছে।[১২] বেশ্যাবৃত্তি সঞ্জাত আয়, কুকুরের বিক্রয় মূল্য[১৩], মূর্তিপূজা[১৪], নরহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ (কযফ)[১৫] এসবই ইসলামে যেমন স্পষ্টভাবে হারাম, তদ্রূপ বাইবেলও তার অনুসারীদের জন্য এগুলোকে চরম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে অনাচার, অন্যায়, যেনা-ব্যাভিচারসহ যে নৈতিক অবক্ষয় মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার

পথিকৃৎ হচ্ছে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা। অপরদিকে ইহূদীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধান বলবৎ করেনি। ফলে তারা যে অভিশপ্ত ছিল সেই অভিশপ্তই রয়ে গেলো। মুসলমানদের এই দুই অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতির দূরভিসন্ধি সম্পর্কে সজাগ হতে হবে এবং তাদের যত দ্রুত সম্ভব আল-কুরআনের ছায়ায় ফিরে আসতে হবে। সত্যিকার অর্থে ইহূদী-খৃষ্টানরা যদি বাইবেলের বিধানসমূহ মেনে চলতো তাহলে মুসলমানরাও এতখানি বিপথগামী হতো না। ঐ দু'টি ধর্মানুসারীদের প্রধান লক্ষই মানবজাতিকে আরো পথভ্রষ্ট করা।

কয়েকটি পরিভাষা

মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'শিজাজ' বলা হয়। আঘাতের পরিমাণ, পরিধি ও গভীরতার ভিত্তিতে 'শিজাজ' মোট এগারো শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. হারিসা ঃ যে আঘাতে চামড়া আঘাতপ্রাপ্ত হয় কিন্তু রক্ত বের হয় না।

দুই. দামি'আহ ঃ যে আঘাতে চোখের পানির মত পদার্থ বের হয়।

তিন. দামিয়াহ ঃ যে আঘাতে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হয়।

চার. বাদি'আহ ঃ যে আঘাতে চামড়া কেটে যায়।

পাঁচ. মুতালাহিমা ঃ যে আঘাতে গোশত কেটে যায় কিন্তু পরে জোড়া লেগে যায়।

ছয়. সিমহাক ঃ যে আঘাত মাথার হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায় কিন্তু তা ছিন্ন হয় না।

সাত. মূদিহা ঃ যে আঘাতে ছয় ক্রমিকে উক্ত ঝিল্লি কেটে হাড় প্রকাশ পায়।

আট. হাশিমা ঃ যে আঘাতে হাড় ভেঙ্গে যায় কিন্তু তা স্থানচ্যুত হয় না।

নয়. মুনক্কিলা ঃ যে আঘাতে হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

দশ. আম্মাহ ঃ যে আঘাতে মাথার খুলি কেটে যায় এবং ক্ষত মগজের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এগার. দামিগা ঃ যে আঘাতে মগজের ঝিল্লি ফেটে ক্ষত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

জুরহ (আঘাত) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

ক. জাইফাহ ঃ যে আঘাতে জখম দেহের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

খ. গায়র জাইফাহ ঃ প্রথমোক্ত শ্রেণীর আওতা বহির্ভূত জখমকে গায়র জাইফাহ বলে। এই শ্রেণীর আঘাত আবার ছয় উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. দামিয়াহ ঃ যে আঘাতে দেহের চামড়া ফেটে রক্ত নির্গত হয়।

দুই. বাদিআহ ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে বা চিরে যায় কিন্তু হাড় অনাবৃত হয় না।

তিন. মুতালাহিমাহ ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত ছিন্ন হয়ে যায়।

চার. মূদিআহ ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে হাড় অনাবৃত হয়ে যায়।

পাঁচ. যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙ্গে যায় কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না।

ছয়. মুনাক্‌কিলাহ ঃ যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।[১৭]
গলার নিম্নাংশ থেকে উরুসন্ধির মধ্যকার জুরহ (আঘাত) জাইফার অন্তর্ভুক্ত। যেমন বক্ষদেশ, পেট, পিঠ, পার্শ্বদ্বয়, অণ্ডকোষ, দুই নিতম্বের মধ্যবর্তী স্থান। হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, গলা ও ঘাড়ের জখম জাইফাহ হিসেবে গণ্য হবে না।[১৮]
শিজাজ ও জাইফাহ বহির্ভূত দেহের অন্যান্য স্থানের জুরহ (আঘাত) সাধারণত গায়র জাইফাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। দেহের গোশত কেটে যাওয়া, হাড় অনাবৃত হওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।[১৯]
দিয়াত ঃ মানব জীবনের ক্ষতি সাধনের কারণে যে আর্থিক জরিমানা (in cash or find) দিতে হয় তাকে দিয়াত বলে।
'আকলা ঃ ভুলবশত হত্যাকান্ডের জরিমানা স্বরূপ যে অর্থ অপরাধীর পক্ষ হয়ে তার পুরুষ আত্মীয়-স্বজন বা কর্মস্থলের সহকর্মীগণ (বিভিন্ন কিস্তিতে বিভক্ত) যে অর্থ প্রদান করে তাকে 'আকিলা বলে।
আর্‌শ ঃ মানবদেহের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের ক্ষতিসাধনের জরিমানা স্বরূপ যে দিয়াত প্রদান করতে হয় তাকে আরশ (الارش) বলে।
দামান ঃ গায়র জাইফাহ-এর অন্তর্ভুক্ত কোন অপরাধের কারণে যে আর্থিক জরিমানা দিতে হয় তাকে দামান বলে।

আঘাত মাত্রেই কিসাস নয়
কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ
وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ. 'এবং জখম বা আঘাতের বদলা অনুরূপ আঘাত।'[২০]
উপরোক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, সমতার নীতি অনুযায়ী সেসব জখমে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই কিসাস কার্যকর হবে। যেমন হাড় ভঙ্গ করলে কিসাস কার্যকর হবে না, তবে দাঁত এর ব্যতিক্রম।[২১]
জাইফাহ-এর আওতাভুক্ত জখমের ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর হবে না। মহানবী স. বলেন ঃ

لاَ قَوَدَ فِى الْمَأْمُوْمَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ.

'আম্মাহ, জাইফাহ ও মুনাক্‌কিলাতে কিসাস নেই।'[২২]
মহানবী স. আরো বলেন, জাইফাহ-এর দিয়াত হলো পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। ইয়ামানের গভর্নর আমর ইব্‌ন হাযম রা.-কে লিখিত পত্রে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন।[২৩] গায়র জাইফাহ-এর দণ্ড বিচারকের সুবিবেচনা মতে দামান (ضمان) বা ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে, এক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর হবে না।[২৪]

কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলী

এক. অপরাধী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যে অঙ্গের ক্ষতি সাধন করেছে তার অনুরূপ অঙ্গ বিদ্যমান থাকতে হবে;
দুই. অপরাধের সম-পরিমাণ শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হতে হবে;
তিন. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড় (গ্রন্থি) থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কিসাস কার্যকর হবে;
চার. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জখম শুকিয়ে যাওয়ার পর কিসাস কার্যকর করতে হবে।
অন্য কথায় অপরাধীর দেহে আহত ব্যক্তির সদৃশ অঙ্গ বিদ্যমান না থাকলে কিসাস কার্যকর হবে না। যেমন অপরাধী কোন ব্যক্তির ডান হাত কেটেছে বা অকেজো করেছে। কিন্তু অপরাধীর দেহে পূর্ব থেকেই ডান হাত নেই। এমতাবস্থায় তার ডান হাতে কিসাস কার্যকর হবে না। একইভাবে ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে অপরাধীর ত্রুটিহীন অঙ্গে কিসাস কার্যকর হবে না।[২৫] গ্রন্থিসন্ধি থেকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করলেই কিসাস কার্যকর হবে। কারণ কিসাস গ্রন্থিসন্ধিতে কার্যকর হয়, হাড়ের উপর নয়।[২৬]

দিয়াত নির্ধারণ

মানবদেহে যেসব অঙ্গ একটি করে বিদ্যমান, যেমন নাক, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ ইত্যাদি, সেই ক্ষেত্রে একটি অঙ্গের ক্ষতিসাধন বা কার্যকারিতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত (এক শত উট) প্রদান বাধ্যকর হবে। যেমন জিহ্বার জন্য ১০০ এবং নাকের জন্যও ১০০ উট প্রদান করতে হবে।[২৭]
যেসব অঙ্গ একাধিক সংখ্যায় বিদ্যমান, যেমন দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, দুই হাতের দশ আঙ্গুল, বত্রিশটি দাঁত ইত্যাদি, সেগুলোর একটি বা একাধিক সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত করলে বা কার্যকারিতা বিলুপ্ত হলে, সংখ্যানুপাতে (আংশিক) দিয়াত ধার্য হবে। যেমন দুই হাতের দিয়াত ১০০ উট, কিন্তু এক হাতের দিয়াত ৫০ উট। দশ আঙ্গুলের দিয়াত ১০০ উট কিন্তু এক আঙ্গুলের দিয়াত দশ উট।[২৮]
দেহে যেসব অঙ্গ বিশ-এর অধিক বিদ্যমান, যেমন ৩২টি দাঁত, সেই হিসেবে ৩২টি দাঁতের দিয়াত হয় ৩২ অংশ পূর্ণ দিয়াত এবং অতিরিক্ত হিসেবে তার এক-পঞ্চমাংশ (অতিরিক্ত) দিয়াত। অর্থাৎ ১০০ উট এবং আরো ৬০টি উট। এই হিসাবে প্রতিটি দাঁতের দিয়াত ৫টি উট।[২৯]
কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে, যেমন দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ উৎপাটন এবং হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কর্তন সম্ভব না হলে অথবা এসব অঙ্গ গ্রন্থিসন্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে থাকলে, সেই সব ক্ষেত্রে দিয়াত ধার্য হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তা লাভ করে থাকে।
মহানবী স. বলেন ঃ

وَفِى الاَنْفِ اِذَااُوْعِبَ جَذْعُهُ الدِّ يَةُ مِائَةٌ مِّنَ الاِبِلِ.

'পুরো নাক কর্তন করলে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ণ দিয়াত ধার্য হবে।'৩০

وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ.

'জিহ্বার জন্য পূর্ণ দিয়া।"৩১

وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةَ.

'পুরুষাঙ্গের জন্য পূর্ণ দিয়াত।'৩২

وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ.

'মেরুদণ্ডের জন্য পূর্ণ দিয়াত।'৩৩

وَفِى العينين الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ

'দুই চোখের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং এক চোখের জন্য তার অর্ধেক।'৩৪

وَفِى الاُذُنِ خَمْسُوْنَ مِنَ الاِبِلِ.

'এক কানের দিয়াত পঞ্চাশ উট।'৩৫

وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.

'দুই ঠোঁটের জন্য পূর্ণ দিয়াত।'৩৬

وَفِى الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ.

'দুই হাতের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং এক হাতের জন্য পঞ্চাশ (উট)।'৩৭

وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِىْ رِوَايَةَ مَالِكٍ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ.

'এক পায়ের জন্য পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক।'৩৮

وَفِى كُلِّ اِصْبَعٍ مِّنَ الاَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِّنَ الاِبِلِ.

'হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।'৩৯

وَفِى الاَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا.

'দাঁতসমূহের প্রতিটির দিয়াত পাঁচটি করে উঠ।'৪০

মূল্যায়ন

মানবদেহের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে ইসলামী দণ্ডবিধির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, নরহত্যার দিয়াত যেমন একশত উট, তদ্রূপ দেহের কোন অঙ্গের দিয়াতও এক শত উট। অর্থাৎ দেহের যে কোন অঙ্গের ক্ষতিপূরণও জানের

ক্ষতিপূরণের সমান। যেমন পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির এক চোখ উৎপাটন করলে কোন কারণে কিসাস স্বরূপ সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাশটি উট বা তার মূল্য প্রদান করবে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দান করেছেন এবং এই পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত করেছেন, সে মুসলিম-অমুসলিম যাই হোক। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জন্য একান্ত জরুরি সহায়ক বা সহকারীর ভূমিকা পালন করে। এ জন্য শরীয়া আইনে তার জান ও তার দেহের অঙ্গের জরিমানা এক সমান ধার্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে মানব জীবনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব খুবই নগণ্য। এই শেষোক্ত আইনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান নেই। শাস্তি সামান্য জেল-জরিমানার মধ্যেই সীমিত। জরিমানাও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ লাভ না করে সরকার লাভ করে থাকে, যদি না বিচারক ভিন্নতর রায় দেন।

পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে মানব দেহের ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে কঠোর আইনী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন কারণবশত অপরাধীর নির্দিষ্ট অঙ্গে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সে উপরোক্ত অঙ্গের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ লাভ করবে। এসব দিক বিবেচনায় মানবজাতির জন্য যে কোন আইন ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী আইন ব্যবস্থাই অধিক কল্যাণকর।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সূরা ৯৫ আত-তীন ঃ ৪ নং আয়াত।
২. সূরা ৩০ আর-রূম ঃ ৩০ নং আয়াত।
৩. গাজী শামছুর রহমান, দণ্ডবিধির ভাষ্য, সংশোধিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৭ খৃ. পৃ. ৭৪৮-৭৭৪, বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে।
৪. সূরা ১৬ আন-নাহল ঃ ১২৬ আয়াত।
৫. সূরা ২২ হজ্জ ঃ ৬০ আয়াত।
৬. সূরা ২ আল-বাকারা ঃ ১৯৪ আয়াত, আরো দ্র. ১৭৮ আয়াত।
৭. সূরা ৫ আল-মাইদা ঃ ৪৫ নং আয়াত।
৮. বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, যাত্রা পুস্তক, ২১ ঃ ২৩-২৫ আয়াত।
৯. সূরা ২ ঃ ১৭৩, ৫ ঃ ৩, ৬ ঃ ১৪৫, ১৬ ঃ ১১৫, বাইবেল, লেবীয় পুস্তক, ১১ ঃ ৭-৮ আয়াত।
১০. সূরা ২ঃ২৭৫-৭৮, ৩ঃ১৩০, ৩০ঃ৩৯, বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩ঃ১৯-২০ আয়াত। আহলে কিতাবের জন্য যে সুদ হারাম তা আল-কুরআনেও উক্ত হয়েছে (দ্র. সূরা ৪ঃ১৬১)।
১১. বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ঃ৫ আয়াত।

১২. বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ২০:৪ আয়াত।
১৩. বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩:১৮ আয়াত।
১৪. বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ২০:২৩ আয়াত।
১৫. বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ২০:১৩-১৬ আয়াত।
১৬. বাদাইউস সানাই ৭খ., পৃ. ২৯৬; তাবঈনুল হাকাইক, ৬খ., পৃ. ১৩২।
১৭. পাকিস্তানের সংশোধিত ইসলামী দণ্ডবিধির আলোকে।
১৮. বাদাইউস সানাই, ৭খ., পৃ. ২৯৬।
১৯. আত-তা'যীর ফিশ-শারীআতিল ইসলামিয়া (উর্দু অনু.) পৃ. ২৩৬।
২০. সূরা ৫:৪৫।
২১. আবু বাক্র আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ২খৃ. পৃ. ৪৪০-১।
২২. সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ৯, নং ২৬৩৭।
২৩. নাসাঈ, দারিমী ও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল কিসাস, বাবুদ-দিয়াত, ২য় ফাসল, নং ৩৪৯২। পূর্ণ দিয়াত এক শত উট বা তার বাজার মূল্য। এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত তেত্রিশটি উট বা তার বাজার মূল্য।
২৪. বরাতের জন্য ১৭ নং টীকা দ্র.।
২৫. বাদাইউস সানাই', ৭খ., পৃ. ২৯৭।
২৬. পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৯৮।
২৭. ঐ বরাত, ৭খ., পৃ. ৩১১।
২৮. বাদাই', ৭খ., পৃ. ৩১৪; তাবাঈনুল হাকাইক, ৬ খ. পৃ. ২৩-৩১; আরও দ্র. ১৭ নং টীকা।
২৯. বাদাই', ৭খ., পৃ. ৩১৪।
৩০. নাসাঈ, দারিমী ও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল কিসাস, নং ৩৪৯২।
৩১. নাসাঈ, কিতাবুল কাসামা, বৈরূত সং ১৯৩০ খৃ. ৮খ., পৃ. ৫৭-৮, সুনান আদ-দারিমী, বৈরূত সং., ২খ., পৃ. ১৯৩।
৩২. নাসাঈ, কাসামা, ৮খ., পৃ. ৫৭-৮; দারিমী, দিয়াত, ২খ. পৃ. ১৯৩।
৩৩. নাসাঈ ও দারিমী, পূর্বোক্ত স্থানে।
৩৪. নাসাঈ, দারিমী ও মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল কিসাস, নং ৩৪৯২।
৩৫. উপরোক্ত বরাত।
৩৬. উপরোক্ত বরাত।
৩৭. দ্র. ৩০ নং টীকা।
৩৮. দ্র. ৩০ নং টীকা।
৩৯. দ্র. ৩০ নং টীকা।
৪০. দ্র. ৩০ নং টীকা।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮ ইং
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা : ৪৩-৬২

তাকলীদ : কেন কার জন্যে

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

আভিধানিক অর্থ : তাকলীদ একটি আরবী শব্দ। 'কিলাদাতুন' ধাতুমূল থেকে উৎসারিত। 'কিলাদাহ্' যদি মানুষের কণ্ঠে পরিধান করানো হয় তাহলে এর অর্থ হয় 'হার' আর যদি পশুর গলায় পরানো হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'দড়ি' বা গলাকাপ। অধিকন্তু কিলাদাহ্ শব্দটি হাদীস শরীফেও 'হার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা রা. বলেন-

'আমি হযরত আসমার কাছ থেকে একটি 'হার' ধার নিলাম। এই হিসাবে 'তাকলীদ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, কাউকে হার পরিধান করানো।[১]

অনুরূপভাবে কারও তাকলীদ করার অর্থ হলো-

কোনরূপ দলীল প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা ও কর্মের অনুসরণ করা।[২] বলাবাহুল্য, শব্দটি এই অর্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংগাঃ ইমাম গাযালী র. বলেছেন : তাকলীদ বলা হয় কারও কথাকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়াকে।[৩] মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান র. তাকলীদের সংগা লিখেছেন এভাবে-'তাকলীদ বলা হয়, কাউকে কোন বিষয়ে প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করে তার অনুসরণ করা। অথবা প্রমাণ ছাড়াই কারো কথাকে গ্রহণ করে নেয়া।[৪] উসূলে ফিকহ্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ হুসামী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ নামীতেও তাকলীদের অনুরূপ সংগা-ই উদ্ধৃত হয়েছে।[৫]

আল্লামা ইবনুল হুমাম র. ও আল্লামা ইবনুন-নুজাইম র. তাকলীদের সংগা দিয়েছেন এভাবে-তাকলীদ বলা হয়, এমন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই আমল করা যার কথা শরীয়তের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।৬ অর্থাৎ যে ব্যক্তির কথা শরীয়তের প্রমাণ বলে বিবেচিত নয় এমন ব্যক্তির কথার উপর দলীল তলব করা ছাড়াই আমল করাকে তাকলীদ বলে।

সার কথা হলো, যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস এবং ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের ধর্মীয় সমস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম নয়; সক্ষম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা উদ্ভাবন ও আহরণ করতে-এমন ব্যক্তির জন্য বিশ্বস্ত, কুরআন-সুন্নাহ ও

লেখক : গবেষক, খতীব। মুহাদ্দিস, আল-জামেয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া, ঢাকা।

ইজমার আলোকে জীবন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম কোন ইমামের অনুসরণকে তাকলীদ বলে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু অনুসারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে অনুসরণীয় ইমাম একজন বিশ্বস্ত পথিকৃৎ এবং সে নিজে দলীল-প্রমাণের আলোকে আপতিত সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম তাই তার জন্য প্রমাণ তলব করাও অনর্থক। অবশ্য আল্লামা ইবনুল হুমামের বক্তব্য থেকে একথাও প্রতিভাত হয়েছে যে, মুকাল্লিদ বা তাকলীদকারী ব্যক্তি তার অনুসরণীয় ইমামের কথাকে শরীয়তের দলীল মনে করে না, বরং শরীয়তের বিধি বিধানের একটি ব্যাখ্যা মনে করে। কেননা, আল্লামা ইবনুলহুমাম তাঁর সংগায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন-যে ব্যক্তির কথা শরীয়তের দলীল বলে বিবেচিত নয় কোনরূপ প্রমাণ তলব করা ছাড়াই এমন ব্যক্তির কথামত আমল করাকেই তাকলীদ বলে।' আর তাকলীদ বলতে আমাদের দেশে সহজ ভাষায় মাযহাব মানাকেই বুঝানো হয়।

তাকলীদের হাকিকত ও ক্ষেত্র

একথা পৃথিবীর কোন মুসলমানই অস্বীকার করতে পারবে না, ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত ও আহ্বান হলো একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা। এমনকি হযরত মুহাম্মদ স. তাঁর কথা ও কর্মের দ্বারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধকেই মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই রসূল স.-এর আনুগত্যও প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। এ জন্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোনটি হালাল কোনটি হারাম, কোনটি বৈধ কোনটি অবৈধ তা নির্ধারিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের স. ফরমানের ভিত্তিতে এবং এসবের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার অবকাশ নেই। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন সত্তাকে সরাসরি আনুগত্যের উপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে নিসন্দেহে সে ইসলামের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের অনিবার্য কর্তব্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর আনুগত্য করা।

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা আছে তারা জানেন, কুরআন ও সুন্নাহে কিছু বিধি-বিধান এমন আছে, যেগুলোর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তাতে কোনরূপ সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্টতা, প্রচ্ছন্নতা কিংবা বাহ্যিক বৈপরীত্য নেই। বরং এসব আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য এমন সহজ সরল ও প্রাঞ্জল যে কোন পাঠক-পাঠমাত্রই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে নির্দ্বিধায়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

'তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।' [হুজুরাত : ৪০ : ১২]

রসূল স. ইরশাদ করেছেন-

'কোন আরব কোন অনারবের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়।'

এই জাতীয় আয়াত ও হাদীসের সরল মর্ম উপলব্ধি করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যেসব আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতা ও বাহ্যিক

বৈপরীত্য রয়েছে সেগুলোর ভাব ও মর্ম উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

'তালাকপ্রাপ্ত নারীগণ তিন 'কুরু' পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।' [বাকারা :২২৮]

পবিত্র আয়াতটিতে ব্যবহৃত 'কুরু' শব্দটি আরবী ভাষায় দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. কুরু অর্থ মাসিক বা ঋতুস্রাব। ২. কুরু অর্থ মাসিক পরবর্তী পবিত্রতাকাল বা তুহ্‌র । সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন মাসিককাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, না তিন তুহর পর্যন্ত? প্রশ্নের এই জট খোলা কি সকলের পক্ষে সম্ভব?

অনুরূপভাবে একটি হাদীসে রসূল স. ইরশাদ করেছেন-

'যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কিরআত-ই-তার কিরআত বলে বিবেচিত হবে।[৭]

অন্য হাদীসে রসূল স. ইরশাদ করেন–

'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামাযই হলো না।'

এখানে দৃশ্যত হাদীস দুটি সংঘাতপূর্ণ। প্রথম হাদীসটির বক্তব্য হলো,ইমামের পিছনে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদীকে কিরআত পড়তে হবে না। আর দ্বিতীয় হাদীসের বক্তব্য হলো, প্রতিটি মুসল্লীর অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। হাদীস দুটির বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নিরসনপূর্বক তার উপর যথার্থ আমল করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

মূলতঃ তাকলীদের প্রকৃত স্বরূপ এটাই। এ ধরনের জটিল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক মর্ম সম্পর্কে যিনি সম্যক অবগত তাঁর কাছ থেকে সঠিক অর্থ ও মর্ম জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। তাহলে এর দ্বারা কি একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, মুকাল্লিদ বা মাযহাবের অনুসারী প্রকৃত অর্থে আনুগত্য করে আল্লাহ ও তার রসূলের। এ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুজতাহিদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সূক্ষ্মবাণীর ব্যাখ্যাতা পথনির্দেশক মাত্র।[৯]

সারকথা হলো, তাকলীদ মানে ইমাম ও মুজতাহিদকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মনে করে তার নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা। এক্ষেত্রে মুকাল্লিদ মুজতাহিদকে অবশ্য অনুসরণীয়ও মনে করে না এবং তাকে শরীয়ত নির্মাতাও মনে করে না।[১০]

অবশ্য উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে ইসলামের সকল বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে ইমাম ও মুজতাহিদের অনুসরণ তথা তাকলীদ জরুরী নয়। বরং ইসলামের যেসব বিষয়ের বর্ণনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য ও ভাষ্য অস্পষ্ট, বাহ্যত বৈপরীত্যপূর্ণ কেবল সেইসব বিষয়েই তাকলীদ করা কর্তব্য। অন্যথায় যেসব আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সেসব বিষয়ে কোন ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ কিংবা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। যেমন বিখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল গনী নাবলূসী র. বলেছেন: শরীতের যেসব বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত- সেসব বিষয়ে চার ইমামের কারোরই অনুসরণ করার

প্রয়োজন নেই। যেমন-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যে ফরয এবং ব্যভিচার,সমকামিতা, শরাব পান, হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি যে হারাম- এসব বিষয়ে তাকলীদের প্রয়োজন নেই।[১১]

এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. লিখেছেন, মাসাইল তিন প্রকার। ১. কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ'র বক্তব্য বাহ্যত দ্বার্থবোধক। ২. কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে বর্ণিত কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য বিরোধপূর্ণ নয়। তবে প্রতিটি ভাষ্যই একাধিক অর্থপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানের কারণে সম্ভাব্য একাধিক অর্থের কোনটি কাছের মনে হয় আবার কোনটি দূরের মনে হয়। ৩. কিছু মাসাইল আছে যেগুলো সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত ভাষ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই এবং একাধিক অর্থেরও অবকাশ নেই-বরং অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

সুতরাং এই তিন প্রকারের প্রথম প্রকারের মাসাইলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দ্বন্দ্বকে দূর করে যথার্থ মর্ম চিহ্নিত করার জন্যে মুজতাহিদকে ইজতিহাদ ও গবেষণা করতে হবে আর অমুজতাহিদকে মুজতাহিদের তাকলীদ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয় 'যন্নিউদ দালালাত'। এ ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য অর্থ সমূহ থেকে যথার্থ অর্থটিকে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করার জন্যে মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হবে আর মুকাল্লিদকে করতে হবে তাকলীদ। তৃতীয় প্রকারটি হলো 'কাতইয়্যুদ-দালালাত' অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদ করাকেও বৈধ মনে করি না এবং তাকলীদ করাকেও।[১২]

প্রয়োজনীয়তা ঃ উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে ইসলামী শরীয়তের এমন কিছু দিক আছে যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের রাহনুমায়ী ও নির্দেশনা ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা ও সে অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়। কাজেই বাধ্য হয়েই তখন কোন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বিজ্ঞ ইমামের তাকলীদ করতে হয়। আমরা বিষয়টিকে আরেকটু খোলাসা করার লক্ষ্যে এ সম্পর্কে আরো তথ্য তুলে ধরতে চাই। বিশেষ করে যারা মনে করেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনকে যেখানে হিদায়াত গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন[১৩] অধিকন্তু রয়েছে হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডার এমতাবস্তায় কোন মুজতাহিদের সাহায্য নিতে হবে কেন?

এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে। কারণ, আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়ই বলে দিবে, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই কি কুরআনে কারীম থেকে জীবন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম গবেষক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বলেছেন : আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় পাঁচটি।

১. আহকাম। তথা ওয়াজিব, সুন্নত, বৈধ-অবৈধ ইত্যাকার বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোকপাত।

ইবাদত, লেন-দেন, সংসার পরিচালনা মানুষের অধিকার সকল প্রকার বিধি-বিধানই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন 'ফকীহ'-এর দায়িত্বে।

২. ভ্রান্তফিরকা চতুষ্টয়-ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক ও মুনাফিকদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা সংক্রান্ত জ্ঞান। এটাকে ইলমুল মুখাসামা বলা হয়। এই ইলমুল মুখাসামা বা তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করার দায়িত্ব মুতাকাল্লিমীন তথা তর্কশাস্ত্রবিদদের।

৩. তাযকির বি-আলাইল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিআমত ও নিদর্শনাবলীর আলোচনা। আসমান-জমিনের সৃষ্টি, বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে অলৌকিকভাবে অবগতকরণ এবং আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতম গুণাবলীর বর্ণনা এই প্রকারের শামিল।

৪. তাযকীর বি-আয়ামিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ দিবসের আলোকে মানুষকে সতর্ক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশে সংঘটিত ঘটনাবলী বর্ণনা করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি যে পুরস্কার অবতীর্ণ করেছেন আর অবাধ্যদেরকে যে শাস্তি প্রদান করেছেন তা মানুষের সামনে তুলে ধরা।

৫. তাযকীর বিল মাওত। অর্থাৎ মৃত্যু ও তৎপরবর্তী হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব,আমলের পাল্লা, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে যে অধ্যায়ে। শেষোক্ত এই তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ-বিস্তারিত জ্ঞানার্জন এবং এ সম্পর্কিত হাদীস ও আছার সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা ওয়ায়িযের দায়িত্ব।[১৪]

বলা বাহুল্য, হাদীসে রসূল সা. যেহেতু পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, যেমন-আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি-যাতে মানুষের সামনে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারেন। [নাহল : ১৬: ৪৪]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যেসব কথা বিবৃত হয়েছে সেগুলোই আরও স্পষ্ট সরল সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে রসূল সা.-এর হাদীসে। তাই বলা যায়, এই পাঁচটি বিষয় হাদীস শরীফের আলোচ্য বিষয়।[১৫]

বলার অপেক্ষা রাখে না, উল্লেখিত পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইলমুল আহকাম' ব্যতীত অবশিষ্ট চারটি বিষয় তুলনামূলকভাবে অনেকটা সহজ। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে যথাযথ ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এই চারটি বিষয় সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের যথার্থ মর্ম হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু ইলমুল আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন উচু মাত্রার মেধা, সূক্ষ্মতর উপলব্ধিশক্তি, প্রখর স্মৃতিশক্তি, উচ্চতর চিন্তা-দর্শন,পর্যাপ্ত পরিমাণে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ও আল-কুরআনের নাসিখ–মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ, যাহির-মুআওয়াল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং সেই সাথে প্রয়োজন সতর্কতা, চিন্তা ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও আল্লাহভীরুতা। এইসব গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিকে হাদীসের পরিভাষায় মুজতাহিদ বলা হয়।[১৬]

প্রশ্ন হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদীস যারা পড়তে পারে না তাদের প্রসঙ্গ তো অবান্তর বরং যারা কুরআন-হাদীস পড়তে পারে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ক'জন পাওয়া যাবে যার মধ্যে মুজতাহিদের উল্লেখিত গুণাবলী রয়েছে। অথচ বিধি-বিধানের জটিলতম এই পথে সকলকেই চলতে হয় অনিবার্যভাবে। সুতরাং যেপথে প্রতিটি সুস্থ মানুষকে অনিবার্যভাবে পথ চলতে হয়- অথচ তার সে পথের যথার্থ ইলম নেই এবং সেই ইলম অর্জনের শর্তাবলী তার মধ্যে অনুপস্থিত তাহলে কি এই কথা অনস্বীকার্যভাবে মেনে নিতে হয় না- এ পথের যাবতীয় ইলম যিনি আত্মস্থ করতে পেরেছেন, যিনি এই জ্ঞান অর্জনের সকল শর্তাবলীতে উত্তীর্ণ এবং মুজতাহিদ অভিধায় ভূষিত কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান মানার ক্ষেত্রে সকল অমুজতাহিদগণ তার অনুসরণ করবে। এটাই তাকলীদ। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

'যদি তোমরা না জান তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।' [নাহল : ১৬ : ৪৩]

তাকলীদের উপমা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসিম নানুতবী র. কোন ইমামের তাকলীদ করাকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ কোন রোগী বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুসরণ করার সাথে তুলনা করে লিখেন-কোন বিজ্ঞ আলেম[১৭] কে তাকলীদ বর্জন করতে দেখে যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি মনে করে তিনিই যখন তাকলীদ করেন না তখন আমি করব কেন? তাহলে এর উপমা এমন-মূর্খ রোগীর মত যে এক ডাক্তারকে দেখেছে, সে অসুস্থ হওয়ার পর অন্য কোন ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে আমি কেন আমার চিকিৎসার জন্যে অন্যের কাছে যাব? আমিও বরং নিজেই নিজের চিকিৎসা করব! আচ্ছা, এমন ব্যক্তিকে আমরা বুদ্ধিমান বলব না বেকুব বলব?[১৮] মূলতঃ অমুজতাহিদ ব্যক্তির জন্যে তাকলীদের বিষয়টিও অনুরূপ।

উপকারিতা ঃ এটা দিবালোকে মত স্পষ্ট, ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধি-বিধান মেনে চলতে কঠিনভাবে আদেশ করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটির উৎসমূল নির্ণয় করাও অধিকাংশ আল্লাহবিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সেখানে যদি কোন অবিসংবাদিত সর্বজনমান্য বিজ্ঞ আলেমের প্রদর্শিত নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার পথ না থাকে তাহলে ইসলামের অধিকাংশ বিধানের উপরই আমল করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেউতো বা প্রতিটি আমলের উৎসমূল সন্ধানের মহানব্রতকে কঠিন চাপ মনে করে ইবাদত-বন্দেগী আর ইসলামী যিন্দেগীর সীমানা ছেড়ে পালাবে আর একান্ত দৃঢ়প্রত্যয়ী যারা তারাও যখন প্রত্যেকেই নিজস্ব গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ মাফিক ইসলামের অনুসরণ করতে যাবে তখন প্রতিটি বিধান-ই বাস্তব রূপায়ণে এসে কতরূপ লাভ করবে তা একমাত্র আলিমূল গায়বই জানেন এবং তখন হয়তো বলাই মুশকিল হবে কোনটি শরীয়তের প্রকৃতরূপ। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. বলেছেন: মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর এটাও একটা অনেক বড় অনুগ্রহ, তিনি সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে তাকলীদের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। তাই জন্মগতভাবেই

মানুষ স্বভাব-চরিত্র এবং মানব জীবনের সকল প্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে একে অন্যের অনুকরণ করতে পারে। যদি মানুষকে অন্যান্য পশুরমত পরিপূর্ণ স্বাধীন রেখে দিতেন এবং মানুষ যদি স্বীয় স্বভাবজাত উপলব্ধি, আল্লাহ কর্তৃক ইলহামী প্রত্যাদেশও অভিজ্ঞতাজাত ধারণার বাইরে অন্য কারও অনুকরণ না করতো তাহলে মানবজাতির ভাগ্যে উত্তম চরিত্র, জীবনযাপনের উত্তীর্ণ পথসমূহ আর সমৃদ্ধির সমূহ সওদা খুব কমই জুটতো! বরং পৃথিবীর সাধারণ মানব শ্রেণী জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধির আলো থেকে সর্বদা-ই বঞ্চিত থাকতো। তখন বরং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জীব-জন্তুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এটা, তিনি মানুষকে পশুসুলভ বন্ধনহীন স্বাধীনতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিগুলোকে স্বচ্ছ দর্পণের মতো করে তৈরি করেছেন- যাতে সে অন্যের জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং বিপুল চিন্তা ও বাস্তবতার ফলাফল ও চিত্রসমূহ নিজের মধ্যে চিত্রিত করে নিতে পারে এবং সেও তার তাকলীদ ও অনুকরণ করতঃ সেসব কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যদিও সে এসব বিষয়ে স্বীয় ইলম ও অভিজ্ঞতার আলোকে কিছুই জানে না।[১৯]

হযরত শাহ সাহেব র. বলেছেন : অন্যের ইলম ও অভিজ্ঞতার আলোকে অনুকরণসুলভ আমলের শক্তি ও প্রেরণা যদি আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে না রাখতেন সৃষ্টিগতভাবেই তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ[২০] মানব জীবনের সমূহ কল্যাণকর্ম ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকতো এবং বাধ্য হতো পাশবিক জীবনযাপন করতে। আর আমরা দেখছি, ইসলামের কল্যাণময় বিধি-বিধান মেনে চলতে পারতো না । ফলে বঞ্চিত হতো ইসলামের আলোকিত জীবনধারা থেকে।

তাকলীদের প্রকার

তাকলীদ দুই প্রকার।

১. অনির্দিষ্টভাবে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন ইমামের তাকলীদ করা। এক মাসআলায় এক ইমামের মত অনুসরণ করল, অন্য মাসআলার ক্ষেত্রে অনুসরণ করল অন্য কোন ইমামের মত। এটাকে তাকলীদ-এ আম, তাকলীদ-এ মুতলাক বা তাকলীদ-এ গায়রে শাখসীও বলে।

২. নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ করা এবং সকল সমস্যার ক্ষেত্রে ওই একই ইমামের মতের অনুসরণ করা। এটাকে তাকলীদে শাখসী বলে।[২১]

হুকুম

সাধারণের জন্যে তাকলীদ করা ওয়াজিব-এটা কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। গবেষক আহলে হাদীসগণও এতে একমত। যারা তাকলীদ না করার দাবীদার তারাও এটাকে অস্বীকার করে না।[২২] তবে বিরোধ হলো তাকলীদ-এ শাখসী নিয়ে।

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের মত হলো, সাধারণ মানুষের জন্যে তাকলীদ-এ শাখসী বা বিশেষ কোন ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব।[২৩]

বলা বাহুল্য, যেসব দলীল প্রমাণ দ্বারা তাকলীদ করা ওয়াজিব' বলে প্রমাণিত হয়- সে ওয়াজিব অনির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করার দ্বারা যেভাবে পালিত হয় তেমনি সুনির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করার মাধ্যমেও তা পরিপূর্ণভাবেই পালিত হয়। কিন্তু ফিৎনাতপ্ত এই আধুনিককালে যেহেতু যখন যে ইমামের ইচ্ছা অনুকরণের অনুমতি দিলে মানুষ রিপু ও নফসের তাড়নায়- নফস ও প্রবৃত্তি যখন যেটাকে পছন্দ করবে তখন ওটাকেই গ্রহণ করবে, পুরো দীনকে রিপু ও নফসের অনুগত করে ফেলবে এবং ইসলামের প্রকৃত আহ্বান হারিয়ে যাবে। তাই তাকলীদ-এ মুতলাক করার এখন আর অবকাশ নেই। এবং এটা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এমন কি অবিসংবাদিত হাদীস বিশারদ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ র. এবং কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গবেষক জনাব নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান পর্যন্ত তদীয় গ্রন্থ আল-ইনসাফ-এ (৫৯ পৃ.) একথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন-

'হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পর মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ইমামের তাকলীদ করার সূচনা হয় এবং সেকালে এটাই ছিল ওয়াজিব।' সারকথা হলো, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা যেহেতু তাকলীদ করা ওয়াজিব বলে প্রমাণিত এই ওয়াজিব পালন ও আদায়ের একমাত্র পথ হলো তাকলীদ-এ শাখসী।[২৪]

কুরআনের আলোকে তাকলীদ

তাকলীদ একটি স্বভাবজাত বিষয়। এটা যে শুধু ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের মধ্যেই সীমিত তা নয়! যে কোন শিল্প, পেশার ক্ষেত্রেই নবীনরা প্রবীণদের অনুকরণ করে থাকে। আধুনিককালের গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা প্রাচীনকালের বিজ্ঞানী-গবেষকদের গবেষণাপত্রকে পথ চলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।[২৫] মানুষের স্বভাবজাত এই সাধারণ রীতিকে কুরআন আরও উৎসাহিত করেছে।কারণ, এ ভিন্ন মানুষ সুস্থ ও সফলভাবে পথ চলতে পারবে না।

প্রথম দলীল

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে 'উলুল আমর'-এর (আনুগত্য কর)!' (সূরা নিসা : ৫৯)

এ আয়াতটিতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি উলুল-আমর'-এরও আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত 'উলুল আমর'- বলতে মুসলমান শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আবার সাহাবী জাবির ইবন আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হযরত মুজাহিদ, আতা ইবনু আবী

রাবাহ্, আতা ইবনুস-সাইব, হযরত হাসান বসরী, হযরত আবুল আলিয়া র. সহ অন্যান্য তাফসীরবিশারদগণের মত হল, এই আয়াতে উলুল আমর' বলতে- ফকীহ্ আলেমগণকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাযী র. এই শেষোক্ত মতকেই বিভিন্ন দলীলের আলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম আবু বকর জাসসাস র. বলেছেন : মূলতঃ এই দুই মত ও ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং উভয়টিই আয়াতের উদ্দেশ্য। কেননা, রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে মানুষ শাসকদের আনুগত্য করে আর শরীয়তের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে উলামা ফোকাহাগণের আনুগত্য করে।[২৭]

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলামের প্রথম কালের মুসলিম শাসকগণ ইসলামের আইন-কানুন সম্পর্কেও হতেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। অথবা তাঁরা সর্বদাই ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আলেম-উলামাকে সঙ্গে রাখতেন-যারা তাদেরকে ধর্মীয় আইন কানুন নির্দেশের ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে দীনী আলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। শাসন ব্যবস্থাও নববী আমল থেকে দূরে সরে পড়তে থাকে। আলেমগণও শাসকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন শাসকগণ কেবল প্রশাসনিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন আর উম্মতের ধর্মীয় বিষয়াবলীর দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন উলামায়ে কেরাম এবং এখনও সর্বত্র এই অবস্থাই বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় 'উলুল আমর' বলতে আলেমগণকেই বুঝতে হবে। আর যদি শাসকদের নির্দেশাবলী ইসলাম সম্মত হয় তাহলে তারাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।[২৮]

সারকথা হলো, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। আনুগত্য করতে বলা হয়েছে উলামা ও ফোকাহাগণের যারা আল্লাহ্ ও রসূলের কালামের ব্যাখ্যাতা। আর এই আনুগত্যের পারিভাষিক নামই তাকলীদ।[২৯] অবশ্য এই আয়াতের পরবর্তী বাক্য-সুতরাং যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে যায় তাহলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।' (নিসা : ৪: ৫৯)

'যদি তোমরা.....বিশ্বাসী হয়ে থাক' একটি আলাদা স্বতন্ত্র বাক্য। এই বাক্যে মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে,সাধারণ মুসলমানগণকে নয়। উল্লেখিত উলুল আমর-এর অর্থ উলামায়ে কেরাম। এর সমর্থনে ইমাম আবু বকর জাসসাস র. লিখেন- উলুল আমরের আনুগত্যের আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্দেশ প্রদান-যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ হয় তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-একথারই প্রমাণ করে উলুল আমর বলতে ফোকাহায়ে কেরামকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে তাঁরই আনুগত্যের আদেশ দান করেছেন। অতঃপর-যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে....বলে, উলুল

আমরকে আদেশ করেছেন-যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহর কিতাব এবং রসূল সা. এর সুন্নাতের প্রতি প্রত্যর্পণ কর এবং এই নির্দেশ ফোকাহাগণের প্রতিই হতেপারে; সাধারণ লোকদের প্রতি এই আদেশ হতে পারে না। কেননা সাধারণ লোক যারা; তারা তো কোন বিরোধপূর্ণ বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের প্রতি প্রত্যর্পণের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যাবলী সমাধানের রীতি-নীতি ও দলীল-প্রমাণ সম্পর্কেও তারা বেখবর। সুতরাং বুঝা যায়, আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে আলেম ও ফকীহগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান র. একথা স্বীকার করেছেন-আয়াতের এই দ্বিতীয় বাক্যে মুজতাহিদগণকেই সম্বোধন করা হয়েছে।[৩০]

সুতরাং এই আয়াতের আলোকে একথা বলার কোন অবকাশ নেই, ইজতিহাদ ও গবেষণা করবার মত যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিও বিরোধপূর্ণ কোন বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান সন্ধান করবে। বরং এটা শুধুই মুজতাহিদগণের দায়িত্ব। সাধারণ শ্রেণীর দায়িত্ব হলো,উলুল আমরের নির্দেশনার আলোকে আল্লাহ ও রসূলেল আনুগত্য করা।[৩১]

দ্বিতীয় প্রমাণ

'আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোন সংবাদ শান্তি সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলো রটিয়ে দেয়। অথচ তারা যদি সেই সংবাদটি রসূলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা উলুল-আমর তাদের মধ্যে যারা ইসতিমবাত ও গবেষণার ক্ষমতা রাখে তারা বিষয়টির মর্ম উপলব্ধি করতে পারত।' [নিসা : ৮৩]

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো, মদীনার মুনাফিকরা শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের কথা-বার্তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিত। কিছু সরল মনের মুসলমান সেসব উড়ো কথাকে বিশ্বাস করে ফেলতো এবং তা আরও প্রচার করে দিত। এতে শহরের পরিবেশ নষ্ট হতো, শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হতো। এ আয়াতটিতে মুসলমানগণকে এই ধরণের আচরণ থেকে বারণ করা হয়েছে এবং তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, লড়াই কিংবা শান্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য যার কানেই পৌছবে সে নিজের থেকে বিষয়টি আমলে নিবে না বরং তা প্রথমে উলুল আমর-শ্রেণীর কাছে পৌছে দিবে। অতঃপর যাদের মধ্যে তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটনের ক্ষমতা আছে তাঁরা বিষয়টির প্রকৃত রহস্য ও মর্ম উদ্ধার করতঃ অন্যদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবে এবং তারা যে সিদ্ধান্ত দিবে সে মতে আমল করবে। এই আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ বিষয়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকহ-এর সর্বসম্মত রীতি মাফিক বিধি-বিধান তথা আহকাম ও মাসাইল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে শানে নুযুলের নির্দিষ্ট অবস্থার স্থলে বরং আয়াতের শব্দাবলীর অর্থগত ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা আয়াতটির প্রতি তাকাই তাহলে এই শিক্ষাই লাভ করি-তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন ও মর্ম উদ্ধারের

দৃষ্টি যাদের নেই তারা এইগুণে গুণান্বিতজনদের কাছে বিবাদপূর্ণ জটিল বিষয়াবলী পেশ করবে। অতঃপর যে সমাধান তারা দিবে সে অনুযায়ী অবশিষ্ট জনেরা আমল করবে।[৩২]
এই আয়াতের অধীনে হযরত ইমাম রাযী র. লিখেছেন-
অতএব, প্রমাণিত হলো, ইসতিমবাত ও গবেষণা শরীয়তের একটি দলীল। আর কিয়াস হয়তো সরাসরি ইসতিমবাত অথবা ইসতিমবাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কিয়াসও শরীয়তের দলীল। একথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাদের বক্তব্য হলো-উল্লেখিত আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. নিত্য-নতুন এমন অনেক বিষয় ও সমস্যা আছে যেগুলোর বিধান ও সমাধান সরাসরি নস' তথা আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় না, তার জন্যে ইসতিমবাতের প্রয়োজন হয়। দুই. ইসতিমবাত শরীয়তের একটি দলীল। তিন. সাধারণ মানুষের জন্যে নিত্য-নৈমিত্যিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের তাকলীদ করা ওয়াজিব।[৩৩]

তৃতীয় প্রমাণ

'যদি তোমরা না জান তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।' [নিসা : ১৬ : ৪০]
এই আয়াতে মূলত এই শিক্ষাই প্রদান করা হয়েছে, যারা যে বিদ্যা ও বিষয়ে অদক্ষ কিংবা অজ্ঞ তাদের কর্তব্য হলো ঐ বিদ্যা ও বিষয়ে যারা দক্ষ এবং প্রাজ্ঞ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে করে সে অনুযায়ী কাজ করা। আর তাকলীদও এটাকেই বলে।৩৪
যদিও এই আয়াতটি বিশেষ একটি প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও তার শব্দাবলীর অর্থগত ব্যাপকতার ভিত্তিতে-তা ব্যাপকতর অর্থেই ব্যবহৃত হবে। কারণ,ফিকহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো-প্রেক্ষাপট ও শানে নুযূলের সংকীর্ণতা নয়, হিসাব হলো শব্দের ব্যাপকতার। অর্থাৎ শানে নুযূল আয়াতটিকে যদিও একটি বিশেষ ঘটনার সাথে আবদ্ধ করে রাখতে চায় অথচ আয়াতের শব্দগুলো এমন ব্যাপক অর্থবহ যে, উল্লেখিত ঘটনার বাইরেও তা সমান কার্যকর এক্ষেত্রে আয়াতটিকে শানে নুযূলের সাথে বেঁধে রাখা যাবে না। শব্দের অর্থানুযায়ী ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। উল্লেখিত আয়াতটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত তার সমর্থনে হযরত জাবির র. থেকে বর্ণিত-বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ দুররে মানসুরে একটি মারফু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি হলো রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, দীনী বিষয়ে যারা জানে তাদের জন্যে উচিত নয় তা জেনেও নীরব থাকা এবং যারা জানে না তাদের জন্যেও উচিত নয় না জানা সত্ত্বেও নীরব থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-
'তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।'
সুতরাং মুমিনের জন্য উচিত হলো,তার আমল শরীয়ত মুতাবিক হচ্ছে না বিরোধী ও পরিপন্থি হচ্ছে তা জেনে নেয়া।
বলা বাহুল্য, এই জানার উপায় একমাত্র এটাই,যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা এবং তারা যা বলে তা মেনে নিয়ে আমল করা। এটাই তাকলীদ, এটাই আনুগত্য।[৩৫]

চতুর্থ প্রমাণ

'আর তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যাতে স্বীয় সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে- যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে-যেন তারা বাঁচতে পারে।' [তাওবা : ১২২]

এ আয়াতটিতে এটাই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সকল মুসলমানকেই জিহাদ বা এই জাতীয় কাজে মশগুল হয়ে পড়া ঠিক নয় বরং উচিত হল,এমন একটি জামাআত তাদের মধ্যে থাকা-যারা রাত-দিন অবিরাম সাধনা করে যাবে দীনী ইলম অর্জনে, দীনের সঠিক উপলব্ধি সাধনে। অতঃপর এই শ্রেণীই যারা ইলম হাসিলের জন্যে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি তাদেরকে ইসলামের বিধি বিধান বলে দিবে।

সুতরাং যারা ইলম সাধনায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন-উল্লেখিত আয়াতটি তাদেরকে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদের দায়িত্ব হলো, অন্যদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত করা। আর অন্যদের কর্তব্য হলো- এদের প্রদর্শিত বিধি-বিধান মোতাবিক আমল করা।[৩৬]

পঞ্চম প্রমাণ

'তারা বলবে,যদি আমরা শোনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে (আজ) দোযখের বাসিন্দা হতাম না।' [মূলক : ৬৭ :১০]

বিখ্যাত তাফসীরকার হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ কোন কোন তাফসীরবিদ শুনতাম বলতে তাকলীদ আর বুঝতাম বলতে তাহ্কীক ও ইজতিহাদকে বুঝিয়েছেন। আর এ দুটিই হলো নাজাত ও পবিত্রাণের পথ। [তাফসীরে আযিযী]

মাওলানা আবদুল হক হক্কানী র. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-সুতরাং মানুষের নাজাত ও সফলতার পথ মাত্র দু'টি। এক. প্রথম ও সহজ পথ হলো,কোন উপদেশদানকারী পথপ্রদর্শকের কথা মত আমল করা। এটা হলো তাকলীদ। পবিত্র কুরআনে এটাকেই আয়াতের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই. দ্বিতীয় হলো স্বীয় বিবেক ও আকলকে কাজে লাগিয়ে মুক্তির পথ নির্ণয় করা। এটা হলো ইজতিহাদ। যদি কারও ভাগ্যে এই দুটির কোনটিই না জুটে তার ধ্বংস ও ব্যর্থতা নিয়ে কি কোন সংশয় করা যায়? [তাফসীরে হক্কানী, ৯/১৪৯]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) বলেন-এই আয়াতে তাকলীদ আর ইজতিহাদকে বুঝানো হয়েছে। এতে প্রতিভাত হলো,দোযখ থেকে বাঁচার পথ দুটি। তাকলীদ অথবা তাহ্কীক।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রয়োজনীয় ইলম না থাকার কারণে তো তাহকীক ও ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়-সুতরাং যদি তাকলীদকেও পরিহার করা হয় তাহলে বাঁচার আর কোন পথ থাকবে কি?[৩৭]

অধিকন্তু মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-তাদের পথ অনুসরণ কর যারা আমার প্রতিই ইনাবাত ও প্রত্যাবর্তন করে। [লুকমান : ৩১ : ১৫]
পৃথিবীর যে কোন নিরপেক্ষ,সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি হযরাতে আইম্মায়ে কেরামের আলোকময় জীবনধারা অধ্যয়ন করবেন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন-তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাঙময় হয়ে ওঠেছে ইখলাস ইনাবাত ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ রূপ। তাঁরা ছিলেন সমকালীন পৃথিবীর ইসলামের পতাকাবাহী ইলম ও আমলের সমন্বিত সংগ্রামের পথিকৃৎ! এই আয়াতে তাঁদেরই অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে।[৩৮]
অবশ্য যাদের হৃদয় তালাবদ্ধ, বিবেক যাদের বিকল, দৃষ্টি যাদের একদেশদর্শী তাদের কথা ভিন্ন।

হাদীসের আলোকে তাকলীদ

প্রথম হাদীস

সাহাবী ইরবায ইবনে সারিয়াহ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক বিষয়ে মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করবে! তখন তোমরা (ধর্মের নামে) আবিস্কৃত নতুন পথ ও মত থেকে বিরত থাকবে! কারণ ওগুলো ভ্রষ্টতাপূর্ণ। বরং তোমাদের কর্তব্য হবে (তখন) আমার ও পথপ্রাপ্ত খোলাফাই রাশিদীনের সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণ করা। এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে তা আঁকড়ে থাকবে।[৩৯]
এই হাদীসে রসূলে করীম সা. অত্যন্ত গুরুত্বসহ স্বীয় সুন্নত ও খোলাফাই রাশিদীনের সুন্নতের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। এতে স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়, রসূলুল্লাহ সা. এর পর যাদের আগমন হবে তাদের উপর খোলাফাই রাশিদীনের আনুগত্য ও তাকলীদ করা ওয়াজিব।[৪০]

দ্বিতীয় হাদীস

সাহাবী হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেনঃ আমার জানা নেই, আর কতদিন তোমাদের মাঝে থাকব! সুতরাং তোমরা-আমার পর দুই ব্যক্তির ইকতিদা ও অনুসরণ করবে। এক. আবু বকর, দুই. উমর।[৪১]
লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এ হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ সা. ইকতিদা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর এই শব্দটি প্রশাসনিক আনুগত্যের অর্থে ব্যবহার হয় না। ব্যবহার হয় দীনি ও ধর্মীয় বিষয়ে আনুগত্যের অর্থে। যেমন আল কুরআনুল কারীমে ধর্মীয় বিষয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সালেহীনের আনুগত্যের কথা বিধৃত হয়েছে এইভাবে-
'এদেরকেই আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দান করেছেন সুতরাং আপনি তাঁদের হিদায়েতের ইকতিদা (অনুসরণ) করুন। (আনআম : ৯০) রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-হযরত আবু বকর

রসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযের ইকতিদা করেন আর অন্য সকলে ইকতিদা করে আবু বকর রা.-এর নামাযের।'[৪২]

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 'ইকতিদা' শব্দটি ধর্মীয় বিষয়ে আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতেও রসূল সা. ধর্মীয় তথা দীনি বিষয়েই হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত উমর রা.-এর আনুগত্য করতে বলেছেন। আর এটাকেই তাকলীদ বলা হয়।[৪৩]

এবং রসূল সা. তাঁর অবর্তমানে হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত উমর রা.-এর তাকলীদ করতে বলেছেন এই হাদীসে।

তৃতীয় হাদীস

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন; 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইলমকে (পৃথিবী থেকে) এমনভাবে ছিনিয়ে নিবেন না যে, তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে তা ছিন্ন করে নিবেন। বরং আলেমগণকে তুলে নেয়ার মাধ্যমেই ইলমকে তুলে নিবেন। অনন্তর যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অশিক্ষিত বোলেম লোকদেরকে নেতা বানাবে। অতপর সেই নেতাদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করা হবে। তারা তখন ইলম ছাড়াই রায় প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।[৪৪]

উল্লেখিত হাদীসটিতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ফতোয়া তথা ধর্মীয় বিষয়ে রায় প্রদান উলামায়ে কেরামের কাজ। মানুষ তাঁদের কাছে ইসলামের বিধি-বিধান জানতে চাইবে; তাঁরা তা তাদেরকে বলে দিবেন আর মানুষ সে অনুযায়ী আমল করবে– এইতো তাকলীদ।

বিশেষভাবে এই হাদীসে আরেকটি কথা বলা হয়েছে, আর তাহলো, রসূল সা. এমন সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যখন কোন আলেম থাকবে না। তখন মূর্খ লোকেরা ফতোয়া দিতে শুরু করবে। প্রশ্ন হলো, যখন এমন সময় উপস্থিত হবে যে, কোন আলেমই বর্তমান নেই তখন অতীতকালের আলেমগণের মতের অনুসরণ করা ছাড়া ইসলামের বিধি-বিধান মানার আর কী উপায় থাকতে পারে? আর এই অনুসরণই তো তাকলীদ। কারণ, যখন জীবিত কোন আলেম নেই; আর যারা বেঁচে আছে তাদের কেউ সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতেও সক্ষম নয় তখনতো শরীয়ত মোতাবেক আমল করার একটিই পথ খোলা থাকে। আর তাহলো, অতীতকালের আলেমগণের অনুসরণ করা।

সুতরাং এই হাদীস একথাই প্রমাণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুজতাহিদ শ্রেণীর আলেমগণ বর্তমান থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে।[৪৫]

চতুর্থ হাদীস

সাহাবী আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে না জেনেই ফতোয়া দিল সেই এর পাপের বোঝা বহন করবে।[৪৬]

এই হাদীস দ্বারাও তাকলীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ, তাকলীদ যদি অবৈধ হতো, এবং কারো ফতোয়ার উপর যদি প্রমাণ তলব করা ছাড়াই আমল করা বৈধ না হতো তাহলে উল্লেখিত অবস্থায় সমস্ত পাপের বোঝা ফতোয়াদাতা কেন বহন করবে? বরং বিনা ইলমে না জেনে ফতোয়া দেয়ার কারণে যেভাবে 'মুফতী' পাপের ভাগী হচ্ছে ঠিক তেমনি ফতোয়ার বিশুদ্ধতা যাচাই না করার কারণে ফতোয়া প্রার্থীকেও পাপের ভাগী হওয়া উচিত ছিল। অথচ পাপের অধিকারী কেবল ফতোয়াদাতা। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি নিজে আলেম নয় তার দায়িত্ব কেবল এতটুকু, তার জানা মতে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীস সমৃদ্ধ জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি তথা আলেমের কাছ থেকে তা জেনে নেয়া! অতপর সেই আলেম যদি তাকে মাসআলা ভুল বলে দেয় তাহলে এর সম্পূর্ণ ভার ফতোয়াদাতাকেই বহন করতে হবে, প্রার্থীকে নয়।[৪৭]

পঞ্চম হাদীস

মুসনাদ-ই আহমাদে হযরত সাহ্ল ইবনে মুআয রা. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন–'এক মহিলা রসূল সা. এর দরবারে এসে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্বামী যুদ্ধে চলে গেছে। সে যখন নামায পড়ত আমি তার ইকতিদা ও অনুসরণ করতাম। এবং তার সকল আমলেরই আমি অনুসরণ করতাম। সুতরাং এখন আপনি আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যা আমাকে তাঁর আমল (অর্থাৎ জিহাদ) এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌছে দিবে।'

এই মহিলা তার আলোচ্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সা. এর খিদমতে নিবেদন করছে, আমি শুধু নামাযেই নয় বরং সকল আমলের ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসরণ করি, ইকতিদা করি অথচ রসূল সা. তাকে নিষেধ করছেন না।[৪৮] এতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় রসূল সা. মহিলা কর্তৃক তার স্বামীর তাকলীদ ও ইকতিদাকে সমর্থন করেছেন।

ষষ্ঠ হাদীস

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে আছে, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন ঃ যার মধ্যে দুটি গুণ আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে লিখে নেন। সেই দুটি গুণ হলো–

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দীনের ক্ষেত্রে তারচে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির প্রতি তাকাবে এবং তার অনুসরণ ও ইকতিদা করবে আর পার্থিব বিষয়ে নিজের চাইতে নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি তাকাবে এবং (এই ভেবে) প্রশংসা করবে। (আল্লাহ আমাকে ভাল রেখেছেন)।[৪৯]

এই হাদীস স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, দীনী বিষয়ে যে যত বড় বিজ্ঞ তার অনুসরণ করা শুধু বৈধ-ই নয় বরং আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। এমন কি এই বৈধতার প্রশ্নে যারা তাকলীদ করেন না, কথিত আহলে হাদীস এবং গায়রে মুকাল্লিদীন সম্প্রদায়ও তর্ক করেন না।[৫০] তাই আমরা এ বিষয়ে প্রমাণের ফিরিস্তি আর দীর্ঘ করছি না।

সাহাবা ও পরবর্তী যুগে তাকলীদ

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাকলীদ কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। রসূলে করীম সা. সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে এ মর্মে আদেশ করে গেছেন, বিধায় বিষয়টি সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর কাছেও কোন অপরিচিত কিংবা অস্পষ্ট ছিল না। বরং সাহাবায়ে কেরামের যুগেই তাকলীদের উপর ব্যাপকভাবে আমল হতো। যে সকল সাহাবী ইলম হাসিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারতেন না কিংবা বিশেষ কোন মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের আলোকে সমাধান পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম হতেন না সেক্ষেত্রে তাঁরা ফকীহ সাহাবীগণের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে সে মতে আমল করতেন। এবং তাদের মধ্যে মুতলাক তাকলীদ এবং শাখসী তাকলীদ-উভয় প্রকারের তাকলীদের-ই প্রচলন ছিল। সবিশেষ মুতলাক তাকলীদ এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৫১] এখানে আমরা কয়েকটি উপমা দিচ্ছি–

১. সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন ঃ একবার হযরত উমর রা. 'জাবিয়াহ' নামক স্থানে বক্তৃতা করলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম সম্পর্কে কিছু জানতে চায় সে যেন উবাই ইবনে কা'ব-এর কাছে যায়; যে ব্যক্তি মীরাছ ও ফারাইয সম্পর্কে কিছু জানতে চায় সে যেন যায়েদ ইবনে ছাবিতের কাছে যায়; যে ব্যক্তি ফিকহ সম্পর্কে জানতে চায় সে যেন মুআয ইবনে জাবালের কাছে যায়; আর যে ব্যক্তি কোন সম্পদ প্রার্থী হয় সে যেন আমার কাছে আসে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সম্পদের অভিভাবক এবং বন্টনকারী বানিয়েছেন।

এই বক্তৃতায় হযরত উমর রা. অত্যন্ত সরলভাবে বলে দিয়েছেন, তাফসীর ফারাইয কিংবা ফিকহ সম্পর্কে জানতে হলে উল্লেখিত বিশিষ্ট আলেম সাহাবীগণের কাছে যেতে হবে। কারণ, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, সকলেই দলীল প্রমাণ বুঝতে পারে না। তাই হযরত উমর রা.-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, যাঁরা দলীল প্রমাণ বোঝার যোগ্য তাঁরা এঁদের কাছ থেকে দলীল প্রমাণসহ ইলম হাসিল করবে আর যারা তত্ত্ব-তথ্য জানার যোগ্য নয় তারা এঁদের কথা মত আমল করে যাবে। তারা যে মাসআলার যে সমাধান বলে দিবেন সে অনুযায়ী কাজ করে যাবে। এটাই তাকলীদ। দেখা গেছে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা নিজেদেরকে মুজতাহিদ এবং দলীল প্রমাণসহ ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের যোগ্য মনে করতেন না-তাঁরা ফকীহ সাহাবীগণের কাছে যেতেন এবং দলীল প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতিরেকে তাদের নির্দেশিত মতানুযায়ী আমল করতেন এবং তাদের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করতেন।

২. হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে কিছু মেয়াদভিত্তিক ঋণী আছে। এমতাবস্থায় পাওনাদার তার পাওনার কিয়দংশ এই শর্তে মাফ করে দিচ্ছে যে, ঋণটা নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বেই দিয়ে দিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ এটাকে অপছন্দ করলেন এবং এই ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করলেন। (মুয়াত্তা মালিক ঃ পৃ. ২৭৯)।
এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন মারফু হাদীস নেই। তাই উল্লেখিত অভিমতটি ছিল তাঁর ইজতিহাদ ও কিয়াসনির্ভর। অথচ এখানে প্রশ্নকারী তাঁর কাছে প্রমাণ চাইছে না এবং আবদুল্লাহ ইবন উমরও কোন প্রমাণ পেশ করেননি। মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মাসআলা বলে দিয়েছেন। এটাই তাকলীদ।[৫২]

তাকলীদকে শিরক কিংবা বিদআত বলা অন্যায়

তাকলীদ যে আল্লাহ ও রসূলের সা. আনুগত্য ও অনুসরণ করার একটি সরল স্বভাবজাত পথ; অধিকন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট ভাষা দ্বারা প্রমাণিত একথা আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রমাণসহ আলোকপাত করেছি। এও বলেছি, তাকলীদ সাহাবায়ে কেরামের রা. যুগ থেকে অদ্যাবধি হকপন্থী আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমল আকীদার নিষ্কণ্টক পথ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।
এ মর্মে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. লিখেন–
'উম্মতে মুসলিমা এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ, শরীয়ত জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে পূর্বসুরীদের উপর ভরসা করবে। যেমন তাবিঈগণ এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভরসা করেছেন, তাবি তাবিঈগণ ভরসা করেছেন তাবিঈগণের উপর। অনুরূপভাবে উম্মতের সকল স্তরের আলেমগণই তাদের পূর্বসূরীগণের উপর ভরসা করেছেন।[৫৩]
অর্থাৎ শরীয়তকে বুঝা ও উপলব্ধি করার এটাই স্বভাবজাত প্রক্রিয়া– পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের প্রতি পূর্ণবিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা করবে এবং তাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামকে বুঝতে সচেষ্ট হবে। আর বাস্তবে ঘটেছেও তাই।
তাকলীদের এই সরল পরিচয় যদি কারও জানা থাকে তাহলে এই কথায় বিভ্রান্ত হবার কোন কারণ নেই যে, তাকলীদ হল শিরক। কেননা, যারা তাকলীদ করেন তারা মূলত আল্লাহ ও রসূলের-ই অনুসরণ করেন মুজতাহিদ ইমামগণের রাহনুমায়ী ও দিকনির্দেশনার আলোকে। আর যেহেতু কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ ও রসূল সা. উম্মতকে বিজ্ঞ আলেমগণের কাছ থেকে এই পথনির্দেশ গ্রহণ করতে বলেছেন– তাই এই পথনির্দেশ গ্রহণ করাটাও আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য হিসেবেই বিবেচিত ও পরিগণিত হবে–এতে কোন সন্দেহ নেই।
তাকলীদকে বিদআত বলাটা অন্যায়! কারণ বিদআত বলা হয়– 'যে জিনিস বা কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূল দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি, এর নির্দেশ দেননি সেই ধরনের জিনিস বা কাজকে

দীনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা–সওয়াব বা আল্লাহ'র নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে এই ধরনের কাজ করা, এর স্বকল্পিত আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এর জন্য কিছু মনগড়া শর্ত ও বিধির প্রবর্তন করা এবং শরীয়তসম্মত কোন কাজ বা বিধির মত এটিরও পাবন্দী করা বা এটিকে নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমল করে যাওয়ার নামই বিদআত।[৫৪]

এক কথায় সুন্নতের বিপরীত হলো বিদআত।[৫৫] অথচ আমরা উল্লেখ করে এসেছি তাকলীদের পক্ষে কুরআন হাদীস এবং মহান সাহাবীগণের ভাষ্যসমূহ, তারপরও কি কোন চক্ষুষ্মান বিবেকবান মানুষ তাকলীদকে বিদআত বলতে পারে?

মূলত তাকলীদ করা বিদআত নয়। বরং তাকলীদ বর্জন করে স্বীয় রিপু নফস ও প্রবৃত্তির গোলামী করা এবং সেটাকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়াটাই ভয়ংকর বিদআত। যারা এই বিদআত রোগে আক্রান্ত তারাই নিজেদের অপরাধ ঢাকা দেবার জন্যে সুন্নতের অনুসরণকে বিদআত বলে প্রচার করে বেড়ায়।

বাস্তব সত্য হলো, মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে মাসাইল উদ্ভাবন করবেন আর মুকাল্লিদ তাঁর তাকলীদ করে সে অনুযায়ী আমল করবে–এটাই সালাফে সালিহীনের মাসলাক। আর এটা বর্জন করে অমুজতাহিদকে মুজতাহিদের মত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান খুঁজতে বলাটাই বিদআত। শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই।[৫৬]

সারকথা হলো, আলোচ্য বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। তাই কোন অবস্থাতেই যাতে সুযোগ সন্ধানীদের রিপু ও নফস পূজার পথ খুলে না যায় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, নফস ও রিপুর কামনা ও অনুসরণ যে মানুষকে ধ্বংসের অতলে নিয়ে ছাড়ে এবং তা যে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে অবৈধ ও জঘন্য সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্য পথে চলার তাওফীক দিন! আমীন!

তথ্যসূত্র

১. আল-কালামুল মুফীদ ফী ইসবাতিত-তাকলীদ, মাওলানা সরফরায খান সফদর, ২৯ পৃ. (তা.বি) মাকতাবা-ই-ইলমিয়াহ, সাহারানপুর, ইউপি, ইন্ডিয়া; তাসহীল-ই-আদিল্লাহ-ই কামিলাহ, মূল শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান। তাসহীল; মুফতী সা'ঈদ আহমদ পালনপুরী, প্রকাশকাল; ১৯৯০ ইং, শাইখুলহিন্দ একাডেমী, দারুল উলূম দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, ৭৫ পৃ.।

২. আল-মুজামুল ওয়াসীত, মুজাম্মাউল-লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, কাহিরা কর্তৃক সংকলিত, কুতুবখানা-ই-হুসায়নিয়া দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, ৭৮৪পৃ.।

৩. আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ, ডক্টর আবদুল কারীম যায়দান, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং, মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত,৪১০ পৃ.।

৪। কাওয়াইদুল ফিকহ, মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী র. প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ ইং, আশরাফী বুকডিপো, দেওবন্দ, ভারত, ২৩৪ পৃ.।

৫। আল-কালামুল মুফীদ ফী ইসবাতিত-তাকলীদ, মাওলানা, সরফরাযখান সফদর, ৩২ পৃ.।

৬. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, মাওলানা, মুফতী তকী উসমানী, পঞ্চম প্রকাশ ১৪৭৮হি. মাকতাবা-ই-দারুল উলূম, করাচী, ১৪ পৃ.।

৭। ইমাম শাওকানী, নাইলুল আওতার, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, বৈরুত ১ম সংস্করণ, ২খ খণ্ড, ২২৮ পৃ.।

৮। প্রাগুক্ত, ঐ,২১৬ পৃ.।

৯। তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, মাওলানা মুফতী তকী উসমানী ৭-১০ পৃ. সংক্ষেপিত।

১০। মুহাযারা-ই-ইলমিয়্যাহ বরমউযূ রদ্দে গায়রে মুকাল্লেদিয়্যাত, মাওলানা রাশিদ আযমী. ২য় খণ্ড, ৭ পৃ. প্রকাশক-দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

১১. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ঐ ১১ পৃ.।

১২. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ১৩ পৃ.।

১৩. আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? [কামার : ৫৪ : ১৭]

১৪. আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত-তাফসীর, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র.।

১৫। মুহাযারা-ই-ইলমিয়্যাহ, ২য় খণ্ড,২ পৃ.।

১৬. প্রাগুক্ত, ৩-৪ পৃ. সংক্ষেপিত।

১৭. আলিম অর্থ এখানে মুজতাহিদ, প্রাবন্ধিক।

১৮. জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী মুহাম্মদ শফী র. ১ম খণ্ড,১৩৫ পৃ. আরিফ কো. দেওবন্দ, (তা.বি.) ভারত।

১৯. আল-বুদূরুল বাযিগাহ, মূল : শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, উর্দু অনু. ডক্টর কাযী মুজীবুর রহমান, ২১০-২১১ পৃ. তা.বি. ওযারাতে মাযহাবী উমুর, হুকুমতে পাকিস্তান,ইসলামাবাদ।

২০. আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, যেসব বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোতে উজ্জ্বল আজকের আধুনিক পৃথিবী তারা সংখ্যায় খুবই অল্প আর অবশিষ্ট অধিকাংশ মানুষই তাদের অনুকরণ করেই হয়েছে উন্নত জীবনের অধিকারী।-প্রাবন্ধিক।

২১. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ১৫ পৃ.: তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৭৫. ৮২ পৃ.

২২. জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১ম খ., ১২৫ পৃ.: তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৮২ পৃ.:

২৩. জাওয়াহিরুল ফিকহ, প্রাগুক্ত

২৪. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৮২-৮৩ পৃ.; জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১ম খণ্ড, ১২৫-১২৭ পৃ.

২৫. আদিল্লায়ে কামিল্লাহ. ৮০পৃ.

২৬. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৮০ পৃ.।

২৭. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ১৬ পৃ.।

২৮. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ. ৮০ পৃ.।

২৯. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ১৭ পৃ.।

৩০. তাকলীদ কি শরঈ হায়ছিয়্যাত, ১৭-১৮ পৃ.।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ২০-পৃ.।

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত, ২৩ পৃ.।

৩৫. তাসহীলে আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৮১ পৃ.।

৩৬. তাকলীদ কি শরঈ হায়ছিয়্যাত, ২২ পৃ.।

৩৭. আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত-তাকলীদ, ৭৭-৭৮ পৃ.

৩৮. প্রাগুক্ত, ৭১ পৃ.।

৩৯. ইমাম তিরমিযী, জামি, কুতুবখানা-ই রশিদিয়্যাহ, দিল্লী; তা.বি. ২য় খণ্ড, ৯২ পৃ.

৪০. মুহাযারা-ই ইলমিয়্যাহ, ২য় খণ্ড,১৯ পৃ.; তাসহীল-ই আদিল্লায়ে কামিলাহ, প্রাগুক্ত,৮১ পৃ. আল কালামুল মুফীদ, ৭৯ পৃ.

৪১. তিরমিযী, মিশকাত, মাকতাবা-ই আশরাফিয়া, দেওবন্দ,তা.বি. ২য় খণ্ড, ৫৬০ পৃ.।

৪২. ইমাম বুখারী, জামি-ই-সহীহ, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, ৯৯পৃ.।

৪৩. তাকলীদ কি শরঈ হায়ছিয়্যাত, ঐ, ২৫-২৮ পৃ.; মুহাযারা-ই-ইলমিয়্যাহ, ঐ ১৯-২০ পৃ.

৪৪. মিশকাত, কিতাবুল ইলম, ৩৩ পৃ.

৪৫. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত,২৮-২৯ পৃ.।

৪৬. ইমাম তিরমিযী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃ.

৪৭. প্রাগুক্ত, ৩২ পৃ.

৪৮. প্রাগুক্ত, ৩২ পৃ.

৪৯. প্রাগুক্ত, ৩২ পৃ.

৫০. তাসহীল-ই-আদিল্লায়ে কামিলাহ, ৮২

৫১. তাকলীদ কী শরঈ হায়ছিয়্যাত-৩৩ পৃ.

৫৩. ইকদুল জীদ,৩১ পৃ.

৫৪. শিরক ও বিদআত, (বাংলা) মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইফাবা, মার্চ ১৯৮৪ ইং, ২৬ পৃ.

৫৫. ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুসতাকীম, মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানভী, মাকতাবা-ই হিজায দেওবন্দ, ৯৫ পৃ.

৫৬. মুকাদ্দিমা ইলাউস-সুনান, ২য় খণ্ড, ১৫ পৃ.।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৮ ইং
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৭৮

এতিম শিশুর উত্তরাধিকার সমস্যা: ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি সমাধান প্রচেষ্টা

** ড. মো. শাহজাহান মন্ডল*
*** ড. রেবা মন্ডল*

১. সূচনা

মুসলিম আইনে এতিম শিশুর উত্তরাধিকারের বিষয়টিকে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে একটি বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। এরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখনই যখন মৃতব্যক্তির বা প্রপজিটাসের[১] ছেলে/মেয়ে থাকার কারণে তারই কোন মৃত ছেলে/মেয়ের সন্তান তার (Propositus) সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। 'নিকটজন দ্বারা দূরের জন্য বঞ্চিত হয়' নামক নীতির প্রয়োগের জন্য এমনটি হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রপজিটাস যদি এক ছেলে এবং এক পোতা/পোতিন কে ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে পোতা/পোতিন[২] তার চাচার দ্বারা বঞ্চিত হবে, কারণ তিনি মৃতব্যক্তির নিকটতর। কিন্তু উক্ত পোতা পোতিনের বাপ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সে ঠিকই মৃতব্যক্তির আরেক ছেলে হিসেবে উত্তরাধিকার পেতো এবং তার মাধ্যমে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে/মেয়ে অর্থাৎ প্রপজিটাসের পোতা-পোতিন সম্পত্তিতে অংশ পেতে পারতো। দেখা যায়, পোতা/পোতিনের বাপ বা নাতি/নাতিনের মা প্রপজিটাসের আগে মৃত্যুবরণ করার জন্য তাদের এই অবস্থা। প্রফেসর এ. হাবিবুর রহমান তাঁর 'মুসলিম আইন' নামক গ্রন্থে বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে– কুরআনের 'আইন মোতাবেক তাহাদের জন্য যেন কোন কিছু করিবার নাই। চাচা সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া সুখ ভোগ করিয়া যাইবে। আর এইসব ভাতিজা ও ভাতিজী পথে পথে মাংগিয়া কালাতিপাত করিবে। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা শোভনীয় না হইলেও আইন যেন চাচার জন্য এক চোখা হইয়া চলিয়াছে।"[৩]

পোতা-পোতিন ও নাতি-নাতিনের এই অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন প্রণীত হয়েছে। সিরিয়া, মরক্কো, মিসর, তিউনিসিয়ার মত বাংলাদেশেও এরূপ আইন

---

*লেখক ঃ *সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*
***সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

প্রণীত হয়েছে।[৪] বাংলাদেশের আইনটির নাম মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (নং ৮), ১৯৬১। এই আইনটি যখন প্রণীত হয় তখন বাংলাদেশ ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান।

২. বিভিন্ন দেশের এতিম শিশুর উত্তরাধিকার আইন

উপর্যুক্ত আইনগুলোর বিধান এক ঝলকে দেখা যায় নিম্নোক্তভাবে:

(ক) সিরিয়া ও মরক্কো :

পোতা, যে শরীয়া আইন অনুযায়ী বঞ্চিত হয় সে, তার বাপ বেঁচে থাকলে যা পেত তা' অথবা বন্টনযোগ্য সম্পত্তির (net estate) ১/৩ অংশ এর মধ্যে যেটি কম সেটি পাবে। পোতিনের জন্য সিরিয়া ও মরক্কোর আইনে কোন বিধান নেই।[৫]

(খ) মিসর ও তিউনিসিয়া:

পোতা-পোতিন ও নাতি-নাতিন, যে শরীয়া আইন অনুযায়ী বঞ্চিত হয় সে, তার বাপ/মা বেঁচে থাকলে যা পেত তা অথবা ১/৩ অংশ এর মধ্যে যেটি কম সেটি পাবে। মিসরে (তিউনিসিয়াতে নয়) পোতা-পোতিনের ছেলে মেয়ে, যত নিম্নগামী হোক, এই বিধানে উত্তরাধিকার পায়।[৬]

(গ) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ :

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা মোতাবেক পোতা পোতিন ও নাতি-নাতিন সবাই তাদের আপন আপন পিতা/মাতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ বাপ/মা বেঁচে থাকলে যা পেত এবং যে যোগ্যতায় পেত তা' এবং সে যোগ্যতায় প্রপজিটাসের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়।

৩. এতিম শিশুর উত্তরাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনের প্রকৃতি

মধ্যপ্রাচের দেশগুলোর তথা সিরিয়া, মরক্কো, মিসর ও তিউনিসিয়ার আইনগুলোর বিধানকে বলা হয় 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত'; কারণ সেখানে ১/৩ অংশের একটি সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছে।[৭] কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই সীমারেখা নেই; বরং বাপ/মা বেঁচে থাকলে যতটুকু পেত ততটুকুই এতিম শিশু পেয়ে থাকে। এটিকে বলা হয 'প্রতিনিধিত্ব নীতি'। মধ্যপ্রাচ্যের নিয়মে প্রপজিটাস কোন অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলেও এই আইন মোতাবেক ধরে নেয়া হয় যে, তিনি এতিম শিশুকে অসিয়ত করে গেছেন।

৪. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আইন মোতাবেক এতিম শিশুর জন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা

সিরিয়া, মরক্কো, মিশর ও তিউনিসিয়ার প্রচলিত আইনে এতিম শিশুর জন্য সম্পত্তি বন্টনের তিনটি নিয়ম ছিল, কোর্ট পদ্ধতি, মুফতি পদ্ধতি ও আবু যাহরা পদ্ধতি। প্রথম দু'টি বর্তমানে কার্যকর নেই। আছে আবু যাহরা পদ্ধতি। এটি প্রদান করেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইসলামী আইনের অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ আবু যাহরা, ১৯৬৪ সালে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সমস্যার সমাধান নিম্নরূপ [যে সমস্যায় প্রপজিটাসের উপস্থিত উত্তরাধিকারী হলো ৪ কন্যা (Four Daughters = 4D), ১ পূর্ণ বোন (Full Sister = FS) এবং ১ পোতিন (One Son's Daughter = SD)] :

টেবিল নং : ১

উত্তরাধিকারী	কুরআন-হাদীস অনুযায়ী	আবু যাহরা পদ্ধতি মোতাবেক
৪ কন্যা (4D)	২/৩ (৬/৯)	২/৩ এর ২/৩ = ৪/৯
১ পূর্ণ বোন (FS)	১/৩ (৩/৯)	২/৩ এর ১/৩ = ২/৯
১ পোতিন (SD)	বঞ্চিত (একাধিক কন্যা দ্বারা)	= ৩/৯

এখানে ক্লাসিক্যাল ল' তথা কুরআন-হাদীস মোতাবেক ৪ কন্যা একত্রে ২/৩ অংশ পায়, তাদের সাথে সহগামী অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে পূর্ণবোন ১/৩ অংশ পায় এবং পোতিন একাধিক কন্যা থাকার দরুন তথা ৪ কন্যা থাকার দরুন বঞ্চিত হয়।

আবু যাহরা পদ্ধতি অনুযায়ী পোতিনের বাপ বেঁচে থাকলে যা পেত তা অথবা কল্পিত অসিয়তের ১/৩ অংশ এর মধ্যে যেটি কম সেটি (১/৩) তাকে দেয়া হয়। বাকি যা থাকে তা' অর্থাৎ ৬/৯ অন্যান্য অংশীদারকে দেয়া হয়। উপর্যুক্ত সমস্যায় কুরআন-হাদীস অনুযায়ী একাধিক কন্যা তথা ৪ কন্যা এই ৬/৯ এর ২/৩ তথা ৪/৯ অংশ পায়, এবং ৬/৯ এর ১/৩ = ২/৯ অংশ পায় পূর্ণবোন। আবু যাহরা পদ্ধতি মোতাবেক সম্পত্তির ১/৩ অথবা তার বাপ/মা বেঁচে থাকলে যা পেত এর মধ্যে কমটুকু প্রথমে এতিম শিশুকে দেয়ার পর বাকিটুকু অন্যান্য অংশীদারকে দেয়া হয় বলে যুক্তি দেখানো হয় যে, এই পদ্ধতিতে অন্যান্য অংশীদারের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

মধ্যপ্রাচ্যের 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রপজিটাস যদি আসলেই অন্য কারো বা কিছুর প্রতি অসিয়ত করে যান তবুও এতিম শিশুর প্রতি 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত'টি অগ্রাধিকার পায় অর্থাৎ শিশুর অসিয়তের সম্পত্তি আগে দেয়ার পর উক্ত ১/৩ সীমার মধ্যে অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা' উক্ত অন্য কাউকে প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট কিছু না থাকলে দেয়া হয় না। যেমন, যদি প্রপজিটাস স্থানীয় মসজিদে ১/৩ সম্পত্তি দান করে থাকেন এবং অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী থাকে স্ত্রী (Wife=W), ১ ছেলে (S=Son) এবং ১ এতিম পোতা (Son' Son=SS), যার বাপ আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে আবু যাহরা পদ্ধতি বা 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' মোতাবেক বন্টন হবে এভাবে :

টেবিল : ২

উত্তরাধিকারী	মুসলিম ল' তথা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী	SS এর বাপ বেঁচে থাকলে বন্টন হতো এভাবে	বাধ্যতামূলক অসিয়ত বা আবু যাহরা পদ্ধতি মোতাবেক
W	২/৩ এর ১/৮ (কুরআনী অংশীদার) =২/২৪	২/৩ এর ১/৮=৪/২৪	২/৩ এর ১/৮ = ২/২৪ = ৪/৪৮
S	২/৩ এর ৭/৮ (অবশিষ্টভোগী) =১৪/২৪	২/৩ এর ৭/৮ এর ১/২ = ১৪/৪৮	২/৩ এর ৭/৮ = ১৪/২৪ = ২৮/৪৮
SS	বঞ্চিত (S কর্তৃক)	২/৩ এর ৭/৮ এর ১/২ =১৪/৪৮	১৪/৪৮ } =১/৩
মসজিদ	১/৩ অসিয়ত হিসেবে=৮/২৪	৮/২৪ = ১৬/৪৮	২/৪৮ }

এখানে SS এর বাপ বেঁচে থাকলে পেত ১৪/৪৮। এটি এখন দেয়া হয় SS কে। যেহেতু এতিম শিশুর অসিয়তকে প্রাধান্য দেয়া হয় সেহেতু তার এবং মসজিদের মধ্যে সম্পত্তির পরিমাণের দিক থেকে অসিয়তকে ধরতে হয় একটি পূর্ণ অসিয়ত এবং এর ১/৩ সীমার মধ্যে তথা ১৬/৪৮ এর মধ্যে ১৪/৪৮, যা কিনা SS এর বাপ বেঁচে থাকলে পেত, তা অগ্রাধিকার হিসেবে দিতে হয় এতিম শিশুকে। বাকি থাকে ১৬/৪৮−১৪/৪৮=২/৪৮। এটি পায় মসজিদ।

এতে দেখা যায়, অসিয়তের বিধান করার মূল উদ্দেশ্য আবু যাহরা পদ্ধতি অনুযায়ী নস্যাৎ হয়ে যায়। অসিয়তের দুটো উদ্দেশ্য থাকে; (ক) প্রপজিটাসের যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তাকে অসিয়তের মাধ্যমে সম্পত্তি প্রদান করার সুযোগ তৈরী করা এবং (খ) প্রপজিটাসকে তার জীবন সায়াহ্নে তার প্রতি সেবা-শশ্রূষাকারী কোন অনাত্মীয়ে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা মানসিক ঋণ শোধ করার সুযোগ তৈরী করা। উপর্যুক্ত উদাহরণে এতিম শিশুকে রাষ্ট্রীয় আইন তথা আবু যাহরা পদ্ধতি মোতাবেক ১৬/৪৮ এর মধ্যে ১৪/৪৮ অংশ বাধ্যতামূলকভাবে অসিয়ত হিসেবে দেয়ার ফলে উল্লেখিত দু'টি উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এমনকি কোন ক্ষেত্রে প্রপজিটাসের প্রকৃত অসিয়তের পুরো ১/৩ অংশও এতিম শিশুকে দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা প্রয়োজন সূরা বাকারার ১৮১ নম্বর আয়াত যেখানে বলা হয়েছে, কেউ যদি অসিয়তের কথা শোনার পর এর বিপরীত করে (তথা এতে কোন পরিবর্তন আনে) তাহলে তার পাপ হবে পরিবর্তনকারীদেরই, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (ফামান বাদ্দা লাহূ বা'দা মা-ছামি'আহূ ফাইন্নামা−ইস্মুহূ 'আলাল্লাজীনা ইউবাদ্দিলূনাহ; ইন্নাল্লা-হা ছামী'উন 'আলীম)।

৫. বাংলাদেশের আইন মোতাবেক এতিম শিশুর জন্য সম্পত্তি বন্টন

এতিম শিশুর উত্তরাধিকার বিষয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা অনুযায়ী ৪ কন্যা, ১ পূর্ণবোন ও ১ পোতিন উত্তরাধিকার পায় নিম্নোক্তভাবে –

টেবিল নং : ৩

উত্তরাধিকারী	কুরআন-হাদীস অনুযায়ী	মু:পা:আ: অধ্যাদেশের ৪ ধারা অনুযায়ী
৪ কন্যা (4D)	২/৩	৪/৬ (প্রত্যেকে ১/৬ করে)
১ পূর্ণ বোন (FS)	১/৩	বঞ্চিত (ছেলে জীবিত ধরে)
১ পোতিন (SD)	বঞ্চিত (একাধিক কন্যা দ্বারা)	২/৬

এখানে শরীয়া আইন' তথা কুরআন-হাদীস মোতাবেক ৪ কন্যা একত্রে ২/৩ অংশ পায় এবং তাদের সাথে সহগামী অবশিষ্ট ভোগী হিসেবে পূর্ণবোন পায় ১/৩ অংশ এবং পোতিন একাধিক কন্যা থাকার দরুন তথা ৪ কন্যা থাকার দরুন বঞ্চিত হয়। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা মোতাবেক পোতিনের বাপকে জীবিত ধরার ফলে পূর্ণবোন বঞ্চিত হয় এবং ৪ কন্যা, ছেলেকে জীবিত ধরার কারণে ছেলের সাথে অবশিষ্ট ভোগীতে পরিণত হয়। ফলে পোতিন পায় ২/৬ আর প্রত্যেক কন্যা ১/৬ হিসেবে ৪ কন্যা পায় ৪/৬ অংশ।

৬. মধ্যপ্রাচ্যের 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' এবং বাংলাদেশের 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' ইসলামী মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা

মধ্যপ্রাচ্যের 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' এবং বাংলাদেশের 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' কয়েকভাবে ইসলামী–মূলনীতির সরাসরি বিরুদ্ধে চলে গেছে, কখনো শাব্দিকভাবে, কখনো ভাবগতভাবে তথা মূলগতভাবে। এই ইসলাম-বিরোধী অবস্থানগুলো নীচে আলোচিত হলো:

(i) এতিম শিশুকে সম্পত্তির অংশ প্রদানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের পদ্ধতির নাম 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত'। কিন্তু অসিয়ত বাধ্যতামূলক হতে পারে কিনা এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের অসিয়ত বিষয়ক বিধান দেখা প্রয়োজন। সূরা বাকারার ১৮০ ও ২৪০ নম্বর আয়াতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

(ক) সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমাদের জন্য বিধান দেওয়া গেল, কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে যদি সে সম্পদ রেখে যায়, (তার) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে (প্রচলিত প্রথায়) অসিয়ত করা সংগত; এটি সাবধানীদের কর্তব্য।'

(খ) সূরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর ভরণ-পোষণ প্রদানের অসিয়ত করে।'

উপরোক্ত ২য় আয়াতে (সূরা বাকারা: ২৪০) স্ত্রীদের প্রতি এক বছরের ভরণ-পোষণ পরিমাণ সম্পদ অসিয়ত করার বিধান রয়েছে। অপরদিকে ১ম আয়াতে (সূরা বাকারা: ১৮০) পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের প্রতি অসিয়ত করার বিধান রয়েছে । কিন্তু ২৪০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত স্ত্রী এবং ১৮০ আয়াতে উল্লেখিত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের অনেকের জন্য পরবর্তীতে সূরা নিসায় প্রপজিটাসের ত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে বিধায় তাদের জন্য অসিয়ত আর কার্যকর হয় না। অতএব এদের মধ্যে যে/যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিতে অংশ পায় না কেবল সে/তারাই অসিয়ত পেয়ে থাকে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এটিও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। স্পষ্টতঃ স্ত্রী ও পিতা-মাতার প্রতি অসিয়ত করা যায় না, কারণ তারা সবাই কুরআনী অংশীদার। এদের মধ্যে শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অসিয়ত করা যায়। উপরন্তু, মুসলিম বিশ্বে এটিও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে, অনাত্মীয় বা অমুসলিম কোন ব্যক্তির প্রতি, বিশেষ করে প্রপজিটাসের জীবনের শেষ সময়ে যে সেবা-শুশ্রূষা করেছে তার প্রতি, এবং কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি, যেমন কোন মসজিদ বা মাদরাসা ইত্যাদির প্রতিও অসিয়ত করা যায়। A.A.A. Fyzee তাঁর Outlines of Muhammadan Law গ্রন্থে M. Sautayra কর্তৃক প্রদত্ত অসিয়তের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে: “A will from the Mussulman's point of view is a divine institution, since its exercise is regulated by the Koran. It offers to the testator the means of correcting to a certain extent the law of succession, and of enabling some of those relatives who are excluded from inheritance to obtain a share in his goods, and of recognizing the services rendered to him by a stranger, or the devotion to him in his last moments.

কিন্তু যে আত্মীয়-স্বজন উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রপজিটাসের সম্পত্তিতে অংশ পায়না বা যারা অনাত্মীয় তাদের প্রতি বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসিয়ত করাটা কখন এবং কেমন প্রপজিটাসের কর্তব্য তার উত্তরে সূরা বাকারার ১৮০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অসিয়ত করা তেমন বা সেই প্রপজিটাসের জন্য একটি বাধ্যবাধ্যকতা যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। অতএব সকল প্রপ্রজিটাসের জন্য অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক নয়। সকল প্রপজিটাসের জন্য যদি অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক হয় তাহলে যত মুসলমান মৃত্যুবরণ করে সবাইকে কি অসিয়ত করতে দেখা যায়? কিংবা সবার মৃত্যুর পরই কি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এতিম শিশুর প্রতি বা মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদির প্রতি অসিয়ত কার্যকর করা হয় ? না। বস্তুতঃ উক্ত ১৮০ নম্বর আয়াতে তেমন প্রপজিটাসের জন্য অসিয়ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কিন্তু কার মৃত্যু কখন হবে তা' কখনই জানা যায় না। তাহলে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া বলতে কি বুঝায়? প্রকৃতপক্ষে এমন প্রপজিটাসকে বুঝায় যে 'মারজুল-মউত'-তথা death illness এ পতিত হয়। মৃত্যুর অসুখ বলতে তেমন অসুখ বোঝায়

যেখানে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে: (ক) অসুখটির জন্যই প্রপজিটাসের মৃত্যু হতে হবে, (খ) অসুখটি তার মনে মৃত্যুর আশংকা তৈরী করবে, এবং (গ) মারাত্মক অসুস্থতার কিছু বাহ্যিক লক্ষণ বুঝা যাবে।

এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে এমন প্রপজিটাসের উপরই অসিয়ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে মারজুল মউতে পতিত হয়েছে। সুতরাং অসিয়ত করা সকল মুসলমানের উপরই ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়। অতএব, মধ্যপ্রাচ্যের বাধ্যতামূলক অসিয়ত তথা আবু যাহরা পদ্ধতিতে প্রপজিটাস কর্তৃক এতিম শিশু বরাবর আবশ্যিকভাবে ধরে নেওয়া অসিয়তের বিধান সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং বলা যায়, কেবলমাত্র যে প্রপজিটাস মৃত্যু মুখে পতিত সে প্রপজিটাসের জন্যই অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক, অন্য যে কোন বা সকল প্রপজিটাসের জন্য এটি বাধ্যতামূলক নয়।

(ii) 'বাধ্যতামূলক' অসিয়ত' বা আবু যাহরা পদ্ধতিতে প্রথমেই এতিম শিশুকে সম্পত্তি দিয়ে দেয়া হয়। তাকে দেয়া হয়, তার বাপ/মা বেঁচে থাকলে যা পেত তা' অথবা ১/৩, এ দু'টোর মধ্যে যেটি কম সেটি। তারপর যা বাকি থাকে তা' বন্টন করা হয় অন্যান্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে। এখানে অন্যান্য উত্তরাধিকারীর তুলনায় এতিম শিশুকে বেশী গুরুত্ব এবং সম্পত্তি প্রদান করা হয়, যা সঙ্গত নয়, কারণ যার সম্পত্তি পাবার কথাই নয় তাকে আগে দেয়ার বিধান এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান। ৪ কন্যা, বোন ও পোতিনের উপর্যুক্ত সমস্যায় আবু যাহরা পদ্ধতিতে প্রথমে পোতিনকে ৩/৯ অংশ দেয়া হয়, তারপর অবশিষ্ট ২/৩ অংশের মধ্যে ৪ কন্যাকে ৪/৯ এবং বোনকে ২/৯ অংশ দেয়া হয়। উপরন্তু, যার কিনা সম্পত্তি মোটেই পাওয়ার কথা ছিল না সেই পোতিন পায় ৩/৯ অথচ বোন পায় তার চেয়ে (৩/৯-২/৯=) ১/৯ পরিমাণ কম অংশ। কাজেই দেখা যায়, এতিম শিশুকে সহায়তা করতে গিয়ে আইনগত উত্তরাধিকারীদের তুলনায় তাকে অনেক বেশী মর্যাদা, গুরুত্ব ও সম্পত্তি প্রদান করা হয়ে যায়। সাধারণ বিবেক এটি গ্রহণ করতে চায় না। এতিম শিশুকে আবু যাহরা পদ্ধতিতে সম্পত্তি প্রদান করতে হলে এমন হওয়া উচিত যে, তার অংশ জীবিত আইনগত উত্তরাধিকারীদের কারো তুলনায় যেন বেশী না হয়, তার/তাদের অংশ বড়জোর সেই জীবিত উত্তরাধিকারীর অংশের সমান হতে পারে যে সবচেয়ে কম পায়।

(iii) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে প্রচলিত 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' তথা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা অনুযায়ী প্রপজিটাসের মৃত পুত্র/কন্যাকে জীবিত ধরা হয় এবং তারা জীবিত থাকলে যা পেতে পারতো তা' এতিম শিশুকে তথা তাদের ছেলে/মেয়েকে দেয়া হয়। এটি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ একটি চিন্তা ও পদ্ধতি। কারণ মৃতরা কখনোই জীবিত হতে পারে না। বরং যারা বেঁচে আছে তারাই এক সময় মৃত্যুবরণ করবে, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা রয়েছে। এতিম শিশুকে সহায়তা করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়

তাহলে একটু শক্তভাবে বলা যেতে পারে, সকল জীবিত উত্তরাধিকারীকে মৃত ধরে সকল সম্পত্তি এতিম শিশুকেই দেয়া কি সঙ্গত হবে? অবশ্য এতিম শিশুকে সহায়তা করার মহৎ উদ্দেশ্যটি এই শক্ত কথা দ্বারা উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৬১ 'র আইনের ৪ ধারার অধীনে এতিম শিশুকে প্রপজিটাসের সম্পত্তি দিতে চাইলে তা' হওয়া উচিত জীবিত আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের চাইতে কম, কিংবা বড়জোর যে সবচে' কম পায় তার অংশের সমান।

(iv) 'আবু যাহরা পদ্ধতি' এবং 'প্রতিনিধিত্ব নীতি', দু'টিতেই মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকে লংঘন করা হয়েছে। সেটি হলো, 'নিকটবর্তীজন দূরবর্তী জনকে বঞ্চিত করে' (nearer in degree excludes the more remote)। যেখানে সাথে পোতা, পোতিন, নাতী ও নাতিন থাকে সেখানে উভয় নিয়মেই পুত্রের উপস্থিতিতে এই চার প্রকার উত্তরাধিকার হিসেবে এতীম শিশু উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায়, যদিও শরীয়া আইনে তারা পায় না। তাহলে nearer in degree excludes the more remote নিয়মের কার্যকারিতা কোথায় থাকে? বরং যতদিন 'আবু যাহরা পদ্ধতি, ও 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' বহাল থাকছে ততদিন উল্টোভাবে বলতে হচ্ছে 'নিকটজন দূরের জনকে বঞ্চিত করে না'; কিংবা 'দূরের জন নিকটজনকে বঞ্চিত করে', অন্ততঃ উপরের (ii) নম্বর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপন বোন প্রপজিটাসের পোতিন অপেক্ষা ১/৯ অংশ কম সম্পত্তি পায়।

(v) বাংলাদেশের 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' অনুযায়ী এতিম শিশুকে উত্তরাধিকার প্রদান করার একটি নেতিবাচক ফল হলো এই যে, সে তার বাপ/ মায়ের প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে জীবিত কুরআনী উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশকে প্রভাবিত করে, কখনও অংশ কমিয়ে দেয়, কখনও তাদের সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে। এর মাধ্যমে খোদ কুরআন শরীফে প্রদত্ত অংশের হেরফের হয়; অন্যকথায় বলা যায়, পবিত্র কুরআন শরীফের স্পষ্ট লংঘন হয়। যেখানে ৪ কন্যা ও পোতিন থাকে সেখানে কুরআন অনুযায়ী ৪ কন্যা ২/৩ (৪/৬) পায় এবং একাধিক কন্যা থাকার দরুন পোতিন বঞ্চিত হয় বলে 'রদ' নীতি অনুযায়ী বাকি ১/৩ অংশ আবার ৪ কন্যার নিকট ফিরে যায়। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব নীতি তথা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা মোতাবেক পোতিনকে তার বাপ (প্রপজিটাসের ছেলে) হিসেবে ধরার দরুন ৪ কন্যা ছেলের সাথে অবশিষ্টভোগীতে পরিণত হয় এবং সে মোতাবেক ৪ কন্যা ৪/৬ এবং পোতিন ২/৬ অংশ পায়। এখানে ৪ কন্যার অংশ প্রভাবিত হয় তথা কুরআনী অংশীদারদের অংশ কমে যায়। এতে করেও কুরআন লংঘিত হয়।

৪ কন্যা ও পোতিনের সাথে যদি আপন পূর্ণ বোনও থাকে তাহলে কুরআন-হাদীস তথা শরীয়া আইন অনুযায়ী ৪ কন্যা ৪/৬ পায়, বোন (একাধিক কন্যা বা পোতিন থাকার কারণে) সহগামী অবশিষ্টভোগী হিসেবে ২/৬ পায় এবং একাধিক কন্যা থাকার কারণে পোতিন বঞ্চিত হয়। কিন্তু ১৯৬১'র আইন মোতাবেক ৪ কন্যা ৪/৬ পেলেও, পোতিনের বাপ তথা

প্রপজিটাসের ছেলেকে জীবিত ধরার দরুন ছেলে দ্বারা বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং পোতিন ২/৬ অংশ পায়। শুধু তাই নয়, একাধিক কন্যা থাকার দরুন যার পাওয়ার কথা নয় সেই· পোতিন এখানে সম্পত্তির অংশ পাচ্ছে অথচ যার পাওয়ার কথা সেই বোন সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব বিষয় ইসলামী আইনের লংঘন ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের বাধ্যতামূলক অসিয়ত তথা আবু যাহরা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা তথা 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং সাংঘর্ষিক। যতদিন এ দু'টো নিয়ম প্রচলিত থাকবে ততদিন এতিম শিশুকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদানের নামে কুরআনের লংঘন হতে থাকবে, যেটি অবাঞ্ছিত। অপরদিকে এতিম শিশুকে অসহায়ত্ব থেকে রক্ষাকল্পে তার জন্য প্রপজিটাসের পক্ষ থেকে তথা তার ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাকে কিছু প্রদান করার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। এদু'টো উদ্দেশ্যের সমন্বয় করা প্রয়োজন তথা এমন একটি সমাধান প্রয়োজন যেখানে (ক) কুরআন-হাদীসের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটবে না, এবং (খ) এতিম শিশুকে প্রপজিটাসের সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ প্রদান করা যাবে।

৭. এতিম শিশুর উত্তরাধিকার বিষয়ক সমস্যার সমাধানে একটি প্রচেষ্টা

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ৯০ নম্বর আয়াত (১৬:৯০) আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়, সদাচরণ ও স্বজনদের দান করতে এবং নিষেধ করেন তিনি পাপাচার, অন্যায় ও ধৃষ্টতা হতে, তিনি উপদেশ দান করেন তোমাদের শিক্ষার জন্য।' এই আয়াতের মধ্যে বর্তমান সমস্যার একটি সমাধানের আলোক বর্তিকা দেখা যায়। সূরা নাহলের ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্টতই আদেশ দেন নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে। অতএব স্বজনদের প্রতি দান করাটা কোন মুসলমানের ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয়, বরং বাধ্যতামূলক। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এতিম শিশু অপেক্ষা তথা পোতা-পোতিন ও নাতি-নাতিন ছাড়া এমন আর কে প্রপজিটাসের নিকটবর্তী আছে যাকে উত্তরাধিকার থেকে লাওয়ারিস অবস্থায় তিনি দেখেন? আর কেউ নেই বলে দেখা যায়। এসব লাওয়ারিস নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রপজিটাসের এক ধরনের দায় থাকে নি:সন্দেহে। কারণ তিনি বেঁচে থাকলে এদের দেখা-শোনা অবশ্যই করতেন। তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এদেরকে দান করাটা প্রপজিটাসের একটি নৈতিক কর্তব্য হিসেবেও গণ্য হতে পারে।

প্রপজিটাসের ত্যক্ত বন্টনযোগ্য সম্পত্তি থেকে যদি বাধ্যতামূলক দান হিসেবে কিছু সম্পত্তি তার একান্ত আপনজন, এতিম পোতা-পোতিন ও নাতি-নাতিনের বরাবর প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা' সূরা নাহালের ৯০ নম্বর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বস্তুতঃ যে পোতা-পোতিন/নাতি-নাতিন, তাদের বাপ/মা প্রপজিটাসের আগেই মৃত্যুবরণ করেছে বলে, লাওয়ারিস হয় তার প্রতি প্রপজিটাসের সম্পত্তি থেকে দান করা অত্র আয়াতের

আলোকে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তবে এমনভাবে এ দানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মধ্যপ্রাচ্যের 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' কিংবা বাংলাদেশের 'প্রতিনিধিত্ব নীতি'র মতো কুরআন-হাদীস লংঘনের কোন অবস্থা সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১২টি সূত্র প্রয়োগ করা যায়, যেগুলোকে একত্রে বলা যায় 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতি।

১. এতিম শিশুকে অনুপস্থিত ধরে উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের সাধারণ নিয়মে সম্পত্তি প্রদান করতে হবে।

২. উত্তরাধিকারীরা প্রত্যেকে যত অংশ পায় তার তত অংশসমূহের যোগফল বের করতে হবে।

৩. উক্ত যোগফল পরিমাণ সম্পত্তি এতিম শিশুকে দান করতে হবে। এতে করে দানের অংশে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ গ্রহণ করা হবে।

৪. দানকৃত সম্পত্তির অংশ যদি উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের সর্বনিম্ন অংশ প্রাপ্তজনের সমান হয় তাহলে এভাবেই বন্টিত হয়ে যাবে, কিন্তু যদি তা' সর্বনিম্ন অংশ প্রাপ্ত জনের অংশের চেয়ে বেশী হয় তাহলে তার সর্বনিম্ন অংশ এতিম শিশুকে প্রদান করে বাকি অংশ উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের অংশের সাথে মিলাতে হবে; সবশেষে সাধারণ নিয়মে তাদের মধ্যে বন্টন হবে।

৫. সাধারণ (হানাফী) নিয়মে যেখানে এতিম শিশু সম্পত্তি পায় সেখানে 'বাধ্যতামূলক দান নীতি' প্রযোজ্য হবে না; যেখানে সে বঞ্চিত হয় সেখানেই এটি প্রযোজ্য হবে।

৬. ছেলের সন্তানাদি মেয়ের সন্তানাদির দ্বিগুণ পাবে (তসিব নীতিতে); এভাবে পাবার পর তাদের ভাই-বোনদের মধ্যে আবার তসিব হবে।

৭. প্রপজিটাস কোন অসিয়ত করে থাকলে তা প্রদানের পর সম্পত্তির বন্টন হবে।

৮. বাধ্যতামূলক দান নীতি এতিম পোতা-পোতিন, নাতি-নাতিন যত নীচে হোক সবার জন্য প্রযোজ্য হবে, যদি তার পিতা/মাতা প্রপজিটাসের আগেই মারা গিয়ে থাকেন। এতিম প্রপোতা, প্রপোতিন, প্রনাতি-প্রনাতিন তার পিতা- মা যা পেত তা' পাবে। তারা সকলে সমান পাবে এবং পোতা-পোতিন ও নাতি-নাতিনের প্রতিনিধিত্ব করবে।

৯. ক. উপস্থিত উত্তরাধিকারী যদি দু'প্রকার হয়, (i) কুরআনী অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী এবং (ii) এতিম শিশু যে কিনা অবশিষ্টভোগী নয়, তাহলে প্রথমে এতিম শিশুর অংশ দিয়ে দিতে হবে; অতঃপর বাকি অংশ উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে যার মধ্য থেকে (১-৮ নম্বর নিয়মে) দানের অংশ হিসেব করতে হবে।

খ. উপস্থিত উত্তরাধিকারী যদি দু'প্রকার হয়, (i) অবশিষ্টভোগী এবং (ii) এতিম শিশু, যে অবশিষ্টভোগী; তাহলে তার স্থানে তার বোনকে (female counterpart) হিসেব করে প্রথমে তার অংশ দিতে হবে; অতঃপর বাকি অংশ উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে; যার মধ্য থেকে (১-৮ নম্বর নিয়মে) দানের অংশ হিসেব করে তার দ্বিগুণ এতিম শিশুকে দিতে হবে।

১০. প্রপজিটাসের মৃত্যুর পর 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতি কার্যকর হবে।

১১. প্রপজিটাস যদি এতিম শিশু, যত নীচে হোক, বরাবর কোন দান করে যান তাহলে 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতি কার্যকর হবে না।

১২. ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কোন উপায়ে এতিম শিশু যদি তার পিতা/ মাতাকে (তথা প্রপজিটাসের ছেলে/মেয়েকে) হত্যা করে তাহলে 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না।

এবার একটি বিশেষ সমস্যাকে চারটি নিয়মে সমাধান করার চেষ্টা করা যায়; (i) মুসলিম শরীয়া ল' তথা কুরআন-হাদীস মতে এখন পর্যন্ত যেভাবে সমাধান করা হয়েছে সেভাবে, (ii) বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা মোতাবেক, (iii) বাধ্যতামূলক অসিয়ত তথা আবু যাহরা পদ্ধতিতে, এবং (iv) প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক দান পদ্ধতিতে। বিশেষ সমস্যাটিতে উপস্থিত উত্তরাধিকারী ৪ কন্যা (4D), পূর্ণ বোন (FS) ও পোতিন (SD)।

(i) মুসলিম শরীয়া ল' অনুযায়ী সমাধান

4D = ২/৩ (কুরআনী অংশীদার হিসেবে)

FS = ১/৩ (সহগামী অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

SD = 0 (২ বা ততোধিক কন্যা দ্বারা *defacto* লাওয়ারিস)

(ii) ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা অনুযায়ী সমাধান

4D = 4/৬ (পুত্রের সাথে অবশিষ্টভোগী হিসেবে, প্রত্যেকে করে)

FS = 0 (পুত্রকে জীবিত ধরার কারণে লাওয়ারিস)

SD = ২/৬ (পোতিন পুত্র হিসেবে গণ্য হওয়ায়)

(iii) বাধ্যতামূলক অসিয়ত বা আবু যাহরা পদ্ধতি মোতাবেক সমাধান

4D = ২/৩ এর ২/৩ = ৪/৯ (কুরআনী অংশীদার হিসেবে)

FS = ২/৩ এর ১/৩ = ২/৯ (কন্যার সাথে সহগামী অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

SD = ৩/৯ (বাধ্যতামূলক অসিয়ত হিসেবে)

(iv) প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক দান পদ্ধতিতে সমাধান

এ পদ্ধতিতে নিম্নরূপ কয়েকটি ধাপে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রদত্ত সমস্যায় প্রপজিটাসের কোন অসিয়ত করা নেই বিধায় উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সরাসরি সাধারণ নিয়মে বন্টন করা যায় (রুল ৭ প্রযোজ্য হলো)।

১ম ধাপ

4D = $\frac{২}{৩}$ (কুরআনী অংশীদার হিসেবে)

FS = $\frac{১}{৩}$ (কন্যার সাথে সহগামী অবশিষ্টভোগী হিসেবে)

SD = 0 (প্রচলিত ক্লাসিকাল নিয়মে লাওয়ারিস)

প্রথমে রুল ১ অনুযায়ী সাধারণ নিয়মে বন্টন করা হয়েছে। SD সাধারণ নিয়মে লাওয়ারিস হয়েছে বিধায় সে 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতিতে সম্পত্তির অংশ পাবে (রুল ৫ প্রযোজ্য)।

২য় ধাপ

দানে 4D এর অংশ = ২/৩ এর ২/৩ = ৪/৯ মোট দান

দানে FS এর অংশ=১/৩ এর ২/৩=১/৯=৪/৯+১/৯=৫/৯ (রুল ২ প্রযোজ্য)।

SD প্রথমে দান হিসেবে পায় = ৫/৯ (রুল ৩ প্রযোজ্য)

দানের পরিমাণ বাদ দেয়ার পর সাধারণ নিয়মে 4D এবং FS পায় ১−৫/৯ = ৪/৯। SD আগেই দান হিসেবে পেয়েছে ৫/৯। এখন 4D ও FS ৪/৯ পাবে এভাবে :

৩য় ধাপ

4D = ৪/৯ এর ২/৩ = ৮/২৭ (প্রত্যেকে ২/২৭ করে)

FS = ৪/৯ এর ১/৩ = ৪/২৭

SD ইতিমধ্যে পেয়েছে ৫/৯ = ১৫/২৭ এটি FS এর অংশ। ৪/২৭ এর চেয়ে বেশী এবং প্রত্যেক কন্যার সর্বনিম্ন ২/২৭ এর চেয়েও বেশী। একজন কন্যার ২/২৭ যাবে SD বরাবর এবং তার ১৫/২৭ নিক্ষিপ্ত হবে উপস্থিত উত্তরাধিকারীদের অংশের মধ্যে। এদের অংশ এখন দাঁড়ায় ১-২/২৭ = ২৫/২৭ যা তারা পাবে সাধারণ নিয়মে।

৪র্থ ধাপ

4D = ২৫/২৭ এর ২/৩ = ৫০/৮১
FS = ২৫/২৭ এর ১/৩ = ২৫/৮১
SD = ২/২৭ = ৬/৮১
} ৮১/৮১ = ১ (রুল ৪ প্রযোজ্য)

এ উদাহরণে/সমস্যায় যদি নাতিনও (DD) থাকতো তাহলে SD ও DD একত্রে ৬/৮১ পেতো এবং তসিব নিয়মে SD ও DD পেতো এভাবে −

SD = ৬/৮১ এর ২/৩ = ১২/২৪৩
DD = ৬/৮১ এর ১/৩ = ৬/২৪৩
} (রুল ৬ প্রযোজ্য)

কিন্তু যদি DD না থেকে থাকে অন্য পোতিনের ১ ছেলে (SDS) ও ১ মেয়ে (SDD) (পুত্রের বংশধর) কিংবা SD না থেকে থাকে নাতিনের ১ ছেলে (DDS) ও ১ মেয়ে (DDD) (কন্যার বংশধর) তাহলে SDS ও SDD প্রত্যেকে SD কে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং DDS ও DDD প্রত্যেকে DD কে প্রতিনিধিত্ব করবে।

এক্ষেত্রে যদি পোতিন তিনজন ধরা হয়, যাদের প্রথম জনের সন্তান না থাকে, দ্বিতীয় জনের থাকে ছেলে (SDS) এবং তৃতীয় জনের থাকে মেয়ে (SDD) তাহলে তারা প্রত্যেকে সমান পাবে নিম্নোক্তভাবে:

SD =৬/৮১ এর ১/৩ = ৬/২৪৩
SDS=৬/৮১ এর ১/৩ = ৬/২৪৩
SDD=৬/৮১ এর ১/৩ =৬/২৪৩

৬/৮১ এর ১/৩ = ৬/২৪৩ প্রত্যেকে (রুল ৮ প্রযোজ্য)

কিন্তু যদি SDS এবং SDD এর মা একজনই হয় তাহলে তারা তাদের মাকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং পাবে নিম্নোক্তভাবে:

SD =৬/৮১ এর ১/২= ৩/৮১
SDS=৬/৮১ এর ১/২ এর ১/২ = ৩/১৬২
SDD=৬/৮১ এর ১/২ এর ১/২ =৩/১৬২

(রুল ৮ প্রযোজ্য)

অনুরূপভাবে যদি পোতিনের (SD) সাথে নাতিন তিনজন ধরা হয়, যাদের প্রথম জনের সন্তান না থাকে, দ্বিতীয় জনের থাকে ছেলে (DDS) এবং তৃতীয় জনের থাকে মেয়ে (DDD) তাহলে তারা প্রত্যেকে পাবে নিম্নোক্তভাবে:

SD = ৬/৮১ এর ২/৫= ১২/৪০৫
DD = ৬/৮১ এর ১/৫= ৬/৪০৫
DDS = ৬/৮১ এর ১/৫= ৬/৪০৫
DDD = ৬/৮১ এর ১/৫= ৬/৪০৫

(রুল ৮ প্রযোজ্য)

কিন্তু যদি DDS এবং DDD এর মা একজনই হয় তাহলে তারা তাদের মাকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং পাবে নিম্নোক্তভাবে:

SD = ৬/৮১ এর ২/৪= ৬/১৬২
DD = ৬/৮১ এর ১/৪= ৩/১৬২
DDS = ৬/৮১ এর ১/৪ এর ১/২= ৩/৩২৪
DDD = ৬/৮১ এর ১/৪ এর ১/২= ৩/৩২৪

(রুল ৮ প্রযোজ্য)

এতিম শিশুর উত্তরাধিকার বিষয়ে দু'টো অনুপম সমস্যা (unique problem) দেখা দিতে পারে যেগুলোর সমাধান হতে পারে রুল ৯.ক. এবং রুল ৯.খ. অনুসরণ করে।

রুল ৯.ক. এর ব্যাখ্যা

প্রথম অনুপম সমস্যা: উপস্থিত উত্তরাধিকারীই যেখানে একজন (বা এক শ্রেণীর) উত্তরাধিকারী হিসেবে সাধারণ নিয়মে পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হয় সেখানে তার কত অংশ দান হিসেবে এতিম শিশুকে দেয়া হবে তা' নির্ধারণ করা জটিল হয়ে পড়ে যেমন, প্রস্তাবিত 'বাধ্যতামূলক দান' পদ্ধতির রুল ১ মোতাবেক প্রথমে উপস্থিত উত্তরাধিকারীর অংশ ১ পরিমাণ হওয়া রুল অনুযায়ী তার সম্ভাব্য দানের অংশ হয় ১ এর ১=১। এক্ষেত্রে প্রথমে এতিম শিশুকে দেয়ার পর বাকিটা উপস্থিত উত্তরাধিকারীকে দেয়া হয়। যেমন, যেখানে ২ কন্যা এবং ১ পোতিন থাকে সেখানে রুল ১ মোতাবেক ২ কন্যা পায় $\frac{2}{3}$ (কুরআনী অংশীদার

হিসেবে) এবং একাধিক কন্যা থাকার দরুন পোতিন লাওয়ারিস বলে 'রদ' নীতিতে বাকি ১/২ ফিরে আসে ২ কন্যার নিকট। ফলে পুরো সম্পত্তিই পায় ২ কন্যা। এক্ষেত্রে রুল ৯.ক. অনুসরণ করতে হবে, প্রথমেই শিশু একাই/এক শ্রেণীর আছে ধরে নিয়ে তাকে তার অংশ দিয়ে বাকিটুকু উপস্থিত উত্তরাধিকারীকে (2D) দিতে হবে এবং এরপর রুল ১-৮ প্রয়োগ করে দানের পরিমাণ বের করতে হবে। সমাধান নিম্নরূপ –

2D SD=১/২	বাকি ১/২	১/২ এর ১/২ = ১/৪ (রুল ২ প্রযোজ্য)	 ১/৪ (দান)	১-১/৪ =৩/৪	৩/৪ (প্রত্যেকে ৩/৮) চূড়ান্তভাবে ১/৪ (বা ২/৮)

এখানে SD কে একা/ এক শ্রেণীর ধরে তার সাধারণ অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ দেয়া হচ্ছে 2D কে। অতঃপর রুল ২ প্রয়োগ করে দানের পরিমাণ (১/৪) বের করা হয়। প্রত্যেক D পায় ৩/৪ এর ১/২ = ৩/৮।

আবার যদি একটি সমস্যায় উত্তরাধিকারী থাকে কেবল এক পুত্র (S) এবং অপর মৃত পুত্রের মেয়ে (SD) তাহলে বন্টন হবে এভাবে –

S (অবশিষ্টভোগী) SD = ১/২	১/২	১/২ এর ১/২ = ১/৪ (রুল ২ প্রযোজ্য)	 ১/৪ (দান)	১-১/৪ =৩/৪	৩/৪ চূড়ান্তভাবে ১/৪

রুল ৯. খ. এর ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় অনুপম সম্যসাঃ আরেকটু জটিল অনুপম সমস্যা তখন দেখা দেয় যখন এতিম শিশু হয় অবশিষ্টভোগী, যখন তার অংশ নির্দিষ্ট হয় না। যেমন যখন প্রপজিটাসের উত্তরাধিকারী থাকে দু'জন, একপুত্র (S) এবং আরেক মৃত পুত্রের ছেলে (SS)। এক্ষেত্রে SS এর একই শ্রেণী ও ডিগ্রীর নারীর (পুত্রের কন্যা, (SD) উপস্থিতি কল্পনা করে প্রাসঙ্গিক রুলসমূহ প্রয়োগ করে তাকে সম্পত্তি দেয়ার পর চূড়ান্তভাবে তার অংশকে দ্বিগুণ করতে হবে। কারণ তার অংশ প্রথমে অর্ধেক ধরা হয়ে থাকে। সমাধানটি হবে এভাবে–S = S

S = S SS=SD	 ১/২	১/২ এর ১/২=১/৪	 ১/৪×২=২/৪=১/২	১-১/২ =১/২	১/২ চূড়ান্তভাবে ১/২

এক্ষেত্রে ১ ছেলের স্থলে ২ ছেলে (2S) থাকলে সমাধান হবে এভাবে–

2S = 2S SS=SD	 ১/২	১/২এর ১/২=১/৪	 ১/৪×২=১/২	১/২ (প্রত্যেকে ১/৪ করে)	 ১/৪ (দান)	১-১/৪=৩/৪ (প্রত্যেকে ৩/৮ করে) ২/৮

এখানে প্রথমে SS এর female counterpart হিসেবে পুত্রের কন্যা (SD) কল্পনা করে তার অর্ধেক দেয়ার পর রুল-২ প্রয়োগ করে 2S এর ১/৪ অংশ বের করা হয়। এটিকে দান হিসেবে SS বরাবর দেয়ার পর দ্বিগুণ করলে ১/২ হয়। বাকি ১/২ 2S কে দিলে প্রত্যেকে পায় ১/৪ করে। এদের মধ্যে সর্বনিম্নপ্রাপ্ত জন অর্থাৎ যে কোন ছেলে (S) পায় ১/৪। এর চেয়ে SS এর অংশ বেশী হওয়া উচিত নয়। তাই যেকোন পুত্রের ১/৪ দান হিসেবে দেয়া হয় SS কে এবং বাকি ৩/৪ দেয়া হয় 2S কে যা তারা প্রত্যেকে নেবে ৩/৮ অংশ হিসেবে।

৮. উপসংহার

কুরআন আল্লাহর বাণী। হাদীস হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের এগুলো মূল উৎস। কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। উত্তরাধিকার বিষয়ক কোন নতুন সমস্যা উপস্থিত হলে কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এতিম শিশুকে প্রপজিটাসের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী করার উদ্দেশ্য মহত সন্দেহ নেই; কিন্তু তা' করতে গিয়ে কুরআনের ব্যত্যয় ঘটানো কোন মুসলমানের কাজ নয়। কোন রাষ্ট্রের সরকারেরও তা' করা উচিত নয়। মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত 'বাধ্যতামূলক অসিয়্যত' এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে প্রচলিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা তথা 'প্রতিনিধিত্ব নীতি' সরাসরি কুরআনকে লংঘন করেছে বলে দেখা যায়। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে যে, নাতি বা নাতনী সম্পত্তির মালিক হয় তার পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে। পিতা বা মাতার মৃত্যুর সাথে তাদের সম্পত্তির মালিকানাও মরে যায়– যেমনটি হয়ে থাকে চাকরীজীবির চাকরীর ক্ষেত্রে। যেহেতু পিতাই সম্পত্তির মালিকানা বঞ্চিত সেক্ষেত্রে এমন পিতার সন্তানদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? তবে এ সমস্যা সমাদানের জন্য এতে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক চান একমাত্র সমাধান হতে পারে। যা আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অতএব প্রথমত, সিরিয়া, মরক্কো, মিশর ও তিউনিসিয়া সরকারের উচিত 'বাধ্যতামূলক অসিয়ত' নীতি বাতিল করা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের উচিত উক্ত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৪ ধারা বাতিল করা। দ্বিতীয়ত, এসব রাষ্ট্রের উচিত অত্র প্রবন্ধে প্রদর্শিত 'বাধ্যতামূলক দান নীতি' গ্রহণ করে বর্তমান আইনের স্থলাভিষিক্ত করা। এতে করে একদিকে এতিম শিশুকে প্রপজিটাসের সম্পত্তিতে অংশ দিয়ে তাকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে এতিম শিশুর উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১. যার সম্পত্তি মৃত্যুর পর বন্টিত হয়। এমন ব্যক্তিকে বোঝাতে আলোচনার সুবিধার্থে এ প্রবন্ধে 'প্রপজিটাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী অঞ্চলে ছেলের ছেলেকে পোতা এবং ছেলের

মেয়েকে পোতিন বলা হয়। হিন্দি ভাষা থেকে এটি বাংলায় এসেছে। সাধারণভাবে মেয়ের ছেলেকে নাতি এবং মেয়ের মেয়েকে নাতিন বলা হয় ।

৩. এম হাবিবুর রহমান, মুসলিম আইন, প্রথম খন্ড, প্রকাশিকা সৈয়দা মর্জিনা খাতুন, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৮।

৪. যেমনঃ (i) Law of Testamentary Dispositions of 1946 in Egypt.
(ii) Law of Personal Status of 1953 in Syria
(iii) Code of Personal Status of 1958 in Morocco.
(iv) Law of Personal Status and Supplement thereto of 1959 in Tunisia
(v) Muslim Family Laws Ordinance of 1961 in Pakistan.
(vi) Muslim Family Laws Ordinance of 1961 in Bangladesh.

৫. N.J. Coulson, Succession in the Muslim Family, Syndicate of the Cambridge University Press, 1971, pp. 144.

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৭. মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে অসিয়ত বা অসিয়তের সম্পত্তি ১/৩ এর বেশী হতে পারে না। অসিয়তকারী এর বেশী অসিয়ত করলেও ১/৩ পর্যন্তই কার্যকর হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

৮. এম. হাবিবুর রহমান, মুসলিম আইন, প্রথম খণ্ড, প্রকাশিকা সৈয়দা মর্জিনা খাতুন, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ.১৭০-১৭১।

৯. Oxford University Press, third edition, 1964, P. 349.

১০. A.A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, third edition, Oxford University Press, 1964, p. 263.

১১. Al-Sirajiyyah, Translated by Rumsey, Calcutta, 1890, 2nd ed., pp. 11-12 এ বর্ণিত হাদীস, মুহম্মদের সা. কথা, হলো এই যে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার দাফন কাফন করতে হয়, দ্বিতীয়ত; তার ঋণ শোধ করতে হয়, তৃতীয়ত; তিনি কোন অসিয়ত করে গেলে ১/৩ সীমা পর্যন্ত শোধ করতে হয় এবং চতুর্থত; উপর্যুক্ত ত্রিবিধ প্রয়োজন মেটানোর পর যা' থাকে তা' উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিয়মানুযায়ী বন্টন করতে হয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-১০৬

দীনের কল্যাণের হেফাযত কিভাবে সম্ভব

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

সমস্ত কল্যাণের ঊর্ধ্বে দীনের কল্যাণের স্থান। কারণ ব্যক্তি ও সমষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে দীনের একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই কল্যাণ সংরক্ষণের ইতিবাচক পদ্ধতি আলোচনা করবো। দীনের কল্যাণ বিভিন্ন প্রকার। এর মধ্যে এক ধরনের কল্যাণ হলো অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য। অন্যান্য কল্যাণের সাথে তার মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এটি হচ্ছে এমন একটি পর্যায় যে পর্যায়ে একটি মহা-সত্যের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এ পর্যায়টি হচ্ছে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান।

এর মধ্যে আর এক ধরনের কল্যাণ হলো প্রয়োজনীয় পর্যায়ের। এগুলো হচ্ছে, চূড়ান্ত নির্দেশের ভিত্তিতে ইবাদাত ও আমল। এ পর্যায়টি অখণ্ড লক্ষ্যাভিসারী ঈমানের অনুসারী। যেমন সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্জ।

এর মধ্যে তৃতীয় এক ধরনের কল্যাণ হলো, যা ঈমানকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে। এগুলো হচ্ছে, নফল পর্যায়ের সৎ ও ভাল কাজ এবং এমন সব কাজ যেগুলো চূড়ান্ত ও ফরয পর্যায়ের নয়। এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের পরে আসে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে। যেমন নফল সালাত, নফল সাদকাহ, নফল সওম ও নফল হজ্জ।[১] এদের প্রত্যেকটির নিম্ন পর্যায় উচ্চ পর্যায়কে পূর্ণতা দান করে। যে মূল ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত থাকে তা হচ্ছে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান। কাজেই এখান থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করবো।

এক. আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে আদেশ এসেছে সমস্ত দায়িত্বশীলদের জন্য। আল্লাহর কাছ থেকে ছাড়পত্র না ঝেঝপলে কোন আমল নির্ভরযোগ্য হয় না। ছাড়া এর আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তি নেই। মহাসত্যের অনুসন্ধানে বুদ্ধিকে পথ দেখাবার জন্য কুরআনুল কারীমে বহুবিধ পথের অবতারণা করা হয়েছে। এই সমস্ত পথের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি ও প্রকৃতির অধিকারী মানুষের যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সত্যিকার ঈমান এ পথের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছে।

দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানের জন্য আসলে অন্তরের বিশ্বাস ও কণ্ঠের উচ্চারণকেই নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয়। কেবলমাত্র কণ্ঠের উচ্চারণ এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে শুধুমাত্র দুনিয়ার অনুশাসনের জন্য কণ্ঠের উচ্চারণ ও মৌখিক স্বীকৃতিকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। মুখে জবরদস্তি হাঁ বা না বলানোর মাধ্যমে অন্তরের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করা যায় না। বল প্রয়োগ করে বা অন্য কোন ওজর দেখিয়ে ঈমান বাতিল বলে ঘোষণা করা বৈধ নয়। যে কোন অবস্থায় ঈমান পরিবর্তন করলে কুফরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[২]

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়

আল্লাহ মানুষের জন্য দু'টি পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তার সাহায্যে সে সৃষ্টির তাৎপর্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। এর একটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষের মধ্যে আল্লাহ এই বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে একটি বিকাশমান শক্তিতে পরিণত করেছেন। এর সাহায্যে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে। অবশ্য এ বস্তু জগতে এ জ্ঞান মূলত ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ এবং সময় ও কালের প্রেক্ষিতে ক্রমপরিবর্তনশীল। বুদ্ধির কল্যাণের হেফাযত অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ মানুষকে অদৃশ্য জগত এবং এই দৃশ্য জগতের যা কিছুর সন্ধান লাভ তার বুদ্ধি একা করতে অক্ষম তা জানার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে এ জগতের প্রকৃতি আলাদা। মানুষকে এ জগত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ও গাফেল রাখতে তিনি চান না। কারণ মানুষ একটি দায়িত্বশীল জীব। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এ পথ দিয়ে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় অদৃশ্য জগতের সাথে এবং মহা সত্যের দ্বার তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই মহা সত্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সত্য জ্ঞান। এই পথটি হচ্ছে নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে অহীর জ্ঞান লাভ।[৩]

বুদ্ধি যেখানে অদৃশ্য জগত এবং দৃশ্য জগতের অনেক কিছুর সন্ধান লাভ করতে পারে না সেখানে তার অহীর উপর নির্ভর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর সাহায্যে মানুষ অদৃশ্য জগতের সত্যের সন্ধান পায়, বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং গভীর চিন্তা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তার স্রষ্টার কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত উপস্থাপন করবো। এ আয়াতগুলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীর চিন্তা ও অনুশীলনের দিকে ধাবিত করে এবং তাকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে পথের সন্ধান দেয়।

বিশ্বাসের জগতে মানুষকে সত্য পথ দেখাবার কুরআনী পদ্ধতি

কুরআন মানুষকে আল্লাহ ও পরকালীন জীবনের প্রতি ঈমানের আহ্বান জানিয়েছে। মানুষ মাত্রেরই আল্লাহর সামনে তার কাজের জবাবদিহি করা এবং তার প্রতিদান লাভে সক্ষম হবার ভিত্তিতে এই পরকালীন জীবন গড়ে ওঠে। কুরআন বিভিন্নভাবে এ আহ্বান জানিয়েছে। কখনো এই বিশ্বে বসবাসকারী জীব হিসেবে, কখনো একজন মানুষ হিসেবে আবার কখনো এই বিশ্ব জাহানের সাথে সম্পর্কিত হবার ভিত্তিতে কুরআন এ আহ্বান জানিয়েছে। এ সবেরই একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং তা হচ্ছে, মানুষকে মহা সত্য জ্ঞান লাভের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়া, যে সত্যের প্রতি সে ঈমান আনবে এবং পরকালে জবাবদিহিতা, হিসাব দান ও পুরস্কার বা শাস্তি লাভের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের জীবন যাপন করবে।

এ বিশ্বকে বিস্তৃত করে তিনি চতুর দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে গতি সঞ্চার করে জীব কুলের বসতি গড়ে তুলেছেন। একে ঘিরে রয়েছে পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, বাতাস, বৃষ্টি ও মেঘমালা। আকাশ ঘিরে রয়েছে নক্ষত্ররাজি। আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত এ ধরনের অসংখ্য বিশ্ব রয়েছে। তার অনেকগুলো আমরা দেখতে পারি আবার অনেকগুলো দেখতে পারি না। অনেকগুলো তিনি সৃষ্টি করেছেন আবার অনেকগুলো সৃষ্টি করবেন। মানুষকে ভিত্তি করে কুরআন এ সবগুলোর আলোচনা করেছে। এর মধ্য থেকে ছোট বড় কোনটাকেই বাদ দেয়নি। শুরু থেকে পৃথিবীর বুকে যাদের অস্তিত্ব ছিল পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, বন-বনানী, বৃষ্টি-মেঘপুঞ্জ এবং এখানে যা কিছু উৎপন্ন হতো শস্য, ফল, উদ্ভিদ ইত্যাদি সবকিছুরই অবতারণা করা হয়েছে কুরআনে। কুরআনের এ ধরনের কিছু আয়াত এখানে উদ্ধৃত হলো।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَه بِرَازِقِيْنَ.

'পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি। আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি পরিমিত ভাবে। এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।'[৪]

আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى.

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ। তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।'[৫]

আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَا كُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْ نَهَا وتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পারো এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান করো, এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'[৬]

তারপর জল-স্থল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ ঘটে, জল-স্থলের সম্পর্ক তার সাথে গভীর।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرَىْ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَابِه الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের উপকার করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য বিশেষ নিদর্শন রয়েছে।'[৭]

এর পূর্বে এসেছে নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

'এক ইলাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি করুণাময়, অতি দয়ালু।'[৮]

وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَ هُمْ مُّظْلِمُونَ- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيمِ- لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ الَّنَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

'তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে। এটা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। শেষ পর্যন্ত তা শুকনো, বাঁকা, পুরানো খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে।'[৯]

তিনি বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالَّمْسَ وَالْسقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

'তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।'[১০]

তিনি বলেন ঃ

وَ أَلْقَى فِى الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنَ تَمِيْدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- وَعَلاَتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

"এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার।'[১১]

কুরআনের এই আয়াত ক'টি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তার চারদিকের বিশ্ব ব্যবস্থা ও বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের দিকে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার অন্তস্থিত সত্য নিরীক্ষণ করে তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। তখন সে বলে ওঠে ঃ যে সৃষ্টি করে সে কি তার মতো হতে পারে যে সৃষ্টি করে না? এ অবস্থায় প্রশান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি ও সহজ সরল বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে, তারা কখনোই সমান হতে পারে না। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব

জাহানের রব আল্লাহর জন্য, 'যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন তারপর পথ নির্দেশ করেছেন।' তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের সবার রব।

আর মানব জীবনের সকল দিকের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারে তার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে আলোচিত হয়েছে। যার জবাব তাকে অবশ্যই দিতে হবে এবং জবাব দিতে গেলে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সে একজন স্রষ্টার সৃষ্টি।

আল্লাহ কুরআনে এ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্বের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে তার এ দুনিয়ার জীবনের সকল সত্য উদঘাটন করেছেন। এভাবে তাকে ক্রমান্বয়ে সত্যের দিকে টেনে এনেছেন। মাঝখান থেকে কোন মিথ্যা এসে এ সত্য থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَاالإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ- الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ- فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন।'[১২]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ- يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ و تَّرَائِبِ

'কাজেই মানুষ চিন্তা করুক কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে। তা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঞ্জরাস্থির মধ্যখান হতে।'[১৩]

আল্লাহ বলেন ঃ

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى- أَلَمْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى

'মানুষ কি মনে করে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বিন্দু ছিল না?'[১৪]

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে। তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি এক সৃষ্টিরূপে। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।'[১৫]

এ আয়াতগুলো এবং আরো বিভিন্ন আয়াত মানুষকে তার অজ্ঞতা এবং তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভুলে যাওয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা এবং এগুলোর জবাব অনুসন্ধান করাকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা তার নেই। কাজেই তার নিজের অস্তিত্ব কি পর্যায়ে আছে এবং কে তাকে অস্তিত্ববান করলো এ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে চিন্তা করতে হবে। তার সৃষ্টি পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে যখন সে অনস্তিত্বের পর্যায় থেকে অস্তিত্ববান হলো এবং এক বিন্দু তুচ্ছ ঘৃণিত পানি থেকে মানুষের অস্তিত্ব লাভ করলো, এ পর্যায়ে প্রথমে রক্তপিণ্ডে পরিণত হলো, তাতে হাড় উৎপন্ন হলো এবং হাড়ে লাগলো গোশতের আস্তরণ, তারপর হয়ে গেল একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস, একজন গর্বিত মানুষ—এ সমস্ত স্তর অস্বীকার করে অযথা বিতর্কে লিপ্ত হবার ক্ষমতা তার নেই।

আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ- أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?'[১৬]

কাজেই ভারসাম্যপূর্ণ সুষম মানবিক প্রকৃতির পক্ষে একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ঃ তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমিই সবকিছুর স্রষ্টা। সবকিছুর উপর তুমি শক্তিশালী। সমস্ত জিনিসের জ্ঞান তুমি রাখো এবং সকল বিষয় তুমি নিয়ন্ত্রণ করে থাকো। বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য তুমি আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। তুমি জানো প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আর তোমার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। আমরা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে রব হিসেবে খুঁজছি; তুমিই সমস্ত জিনিসের রব। হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি যা কিছু তুমি নাযিল করেছ তার প্রতি এবং আমরা রসূলের আনুগত্য করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

এ বিশ্ব জাহানের সমস্ত অংশ একটির সাথে অন্যটি সংশ্লিষ্ট এবং তাদের সবার গতির মধ্যেও একটি সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সত্য ও মহাসত্যের অনুসন্ধানে এর

সম্পর্কে চিন্তা করে মানুষ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং এক অংশ থেকে অন্য এক অংশে পৌছে যায়। যেমন মাতৃগর্ভে অন্ধকারে তার অস্তিত্বের পথ পরিক্রমায় সে এক পর্যায় থেকে অন্য এক পর্যায়ে পৌছে গিয়ে থাকে।
এই পর্যায়ান্তরে স্থানান্তরিত হবার বিষয়টি আমরা ইবরাহীম আ.-এর ঘটনাবলীতে দেখতে পাই।
আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ

'এভাবে ইবরাহীমকে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই এবং যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।'[১২]
তিনি তাঁর চিন্তা স্থানান্তরিত করলেন নক্ষত্র থেকে চাঁদের দিকে, তারপর চাঁদ থেকে সূর্যের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখ ফিরিয়ে দিলেন সেই সৃষ্টিকর্তার দিকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। শিরক প্রতিরোধ করলেন এবং আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশনার মাধ্যমে পথ নির্দেশ লাভ করলেন।
মানুষ অহীর পথ নির্দেশনার মাধ্যমে মহাসত্যের কাছে পৌছে যায়। এ মহাসত্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা ও এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা, তাঁর সাথে সম্পর্কের বাঁধন সুদৃঢ় করা, এই স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়া। তাঁকে মর্যাদা এবং উচ্চ মর্যাদা দান করা এবং এভাবে অন্য কারোর নয়, একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হওয়া।

এই বিশ্বে মানুষের অবস্থা এবং তার সাথে সম্পর্ক

বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক কোন পর্যায়ের? মানুষ এই বিশ্বের জীবকুলের মধ্যে অন্যতম। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তার বসতি স্থাপন করিয়েছেন। এখানে বহু বিচিত্র গুণের অধিকারী সৃষ্টির সাথে নিজস্ব গুণ বৈচিত্রসহ সে একত্র বসবাস করে।
তার মধ্যে বস্তুগুণ রয়েছে। কারণ সে মাটির তৈরি। তার মধ্যে উদ্ভিদ গুণ রয়েছে। কারণ উদ্ভিদের মতো সেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও উদ্ভিদের আরো বহুগুণ তার মধ্যে রয়েছে। পশুর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবৃত্তি ও গুণাবলীর সাথেও তার মিল রয়েছে। যেমন সেও তাদের মতো পানাহার ও বংশবৃদ্ধি করে।
কিন্তু এই ধরনের একাত্মতা সত্ত্বেও আল্লাহ তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে মর্যাদাশালী করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট গুণাবলী দান করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই গুণগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো বুদ্ধিবৃত্তি। সন্দেহ নেই মানুষ এই বিশ্বের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত এবং এ হিসাবে এখানে তার একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। বরং বলা যায়, মানুষ এই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত অংশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে এবং তার সমস্ত লাভ ও কল্যাণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। এর একটি হচ্ছে ঃ লাভ ও কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করা ও কাজে লাগানো। আর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে ঃ বিশ্ব এবং তার মধ্যে যেসব নিদর্শন আছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। প্রথম দিকটি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে যখনই বিশ্বের কোন একটি অংশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তখনই সেই সাথে তার মধ্যে মানুষের জন্য কি লাভ ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি।'[১৮]

আল্লাহ্ বলেন ঃ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

'এটা তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর ভোগের জন্য।'[১৯]
এর আগে বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসব্জির কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত উদ্ভিদজাত খাদ্য মানুষের ও তার পশুর ভোগ্যসামগ্রী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ- وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ

'তিনি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা থেকে তোমরা খাদ্য পেয়ে থাকো। এবং তোমরা যখন গোধুলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে এসে থাকো এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে চূড়ান্ত ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌছাতে পারতে না।'[২০]
চতুষ্পদ জন্তুর সাহায্যে মানুষ যে উপকৃত হয় তার মধ্যে এগুলো ছাড়া কুরআনে আরো বিভিন্ন বস্তু, নদী, বায়ু, মেঘমালা, বৃষ্টি, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, রাত দিন ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে নিজের কল্যাণে নিয়োগ ও ব্যবহার করার পর্যায়ে মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছে। এ থেকেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, এই বিশ্বে সে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন সত্তা। এর ফলে তার স্রষ্টা তার জন্য এই বিশ্বে বিশেষভাবে যেসব অনুগ্রহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন সেদিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পথে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে বিশ্ব ও প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক। এই বিশ্বকে সে তার চিন্তার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিশ্বের সমস্ত অংশ ও ঘটনাবলীকে কুরআন মানুষের অনুভবগ্রাহ্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। যেমন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা, চোখে দেখা, কানে শোনা এবং এমন সব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনা করা যা থেকে চিন্তা করার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন– ভেবে দেখে, চিন্তা করে, জানে, গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে, বিশ্বাস করে, বোঝে, স্মরণ করে এবং এ ধরনের আরো অনেক শব্দ।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

'তারা কি লক্ষ করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য?' [২১]

আল্লাহ বলেন ঃ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক না কেন।'[২২]

আল্লাহ বলেন ঃ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

'তারা কি নিজেদের সত্তার ব্যাপারে চিন্তা করে না?' [২৩]

চিন্তা-ভাবনা করা সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর শেষে বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'এর মধ্যে রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।' [২৪]

আরো বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'এর মধ্যে রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।'[২৫]

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত এগুলো ছাড়া বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখিত দুই ধরনের সংযোগ পদ্ধতিতে এবং এই সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার পদ্ধতিতে কুরআন বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক-এর উৎস

প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। আকাশ ও পৃথিবীর রবের শপথ, অবশ্যই তোমাদের বাক-স্ফুর্তির মতো এ সকলই সত্য।"[২৬]

আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের সাহায্যে মানুষ ঈমানে পৌঁছে যায়। আল্লাহর মহিমান্বিত ও পূর্ণতার গুণাবলীতে সে তাঁকে গুণান্বিত করে। আত্মসমর্পন ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে বিনত ও বিনম্র করে মু'মিন ও সত্যবাদীতে পরিণত হয়। কণ্ঠের সাহায্যে সে অহী বাহিত সংবাদের স্বীকৃতি দেয়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করে না।

সারকথা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমানই দীনের মূল বিষয়। আল্লাহর পথ নির্দেশনায় মানুষ সেখানে পৌঁছে যায়। বুদ্ধির সামনে নানান যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অহীর সাহায্যে আল্লাহ এ পথনির্দেশ দান করেন। কুরআন তার যুক্তি-প্রমাণ ও নির্দেশের মাধ্যমে বহু পথ দেখায়, যাতে বুদ্ধির অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে যথার্থ পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে কুরআন বিশ্বের ছোট বড় প্রত্যেকটি অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এ সম্পর্কে বুদ্ধিকে সতর্ক ও সজাগ করে তোলে। তার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ ও দ্বন্দ্বমূলক যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মানুষের চিন্তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পাকড়াও করে মহাসত্যের কাছে নিয়ে যায়। এই মহাসত্য হচ্ছে এই অস্তিত্বের জগতের স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি ঈমান। এভাবে যথার্থ ঈমানের মাধ্যমে দীনও অর্জিত হয়। দীনের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ হচ্ছে তা নিজের ব্যাপারে হয় উদারচেতা, নিকৃষ্টতম বিপথগামীকেও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে উপরে উঠায় এবং অধিকতর বাঞ্ছনীয় কল্যাণকে টেনে আনে। নবী কারীম-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? জবাব দিয়েছিলেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান। এক্ষেত্রে ঈমানকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে চিহ্নিত করার মূলে ছিল তার সর্বোত্তম কল্যাণের ধারক হওয়া ও নিজের ও পরিপার্শ্বের মর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়ে নিকৃষ্টতম অসৎবৃত্তিকে হটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করা। এর কল্যাণ দুই প্রকারের। একটি দ্রুত অর্জিত হয়। যেমন ইসলামের বিধান জারী করা এবং ধন, প্রাণ, সহায়-সম্পদ, মর্যাদা ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা লাভ করা। দ্বিতীয়টি বিলম্বে অর্জিত হয়। যেমন জান্নাতে প্রবেশ করা। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।[২৭]

মানুষের দ্বিতীয় অবস্থান ফরয ইবাদত

অন্তরে ঈমানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর মানুষ দ্বিতীয় অবস্থানে চলে আসে। এটি হচ্ছে ইবাদতের পর্যায়। ইবাদত বলা হয় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আনুগত্য করাকে। এ অবস্থায় ইবাদতকারীর জন্য ইবাদত গৃহের প্রয়োজন হয়।

এটিই প্রচলিত রীতি। দীন প্রতিষ্ঠা, তাকে পূর্ণতা দান ও সংরক্ষিত করার জন্য এটি একটি বুনিয়াদী কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর মধ্যে মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় কাজকেই শামিল করা হয়। মহান ও পাক-পবিত্র আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতির সাথে এগুলো জড়িত। তিনি মানুষ ও বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা। আল্লাহর অস্তিত্বের এই স্বীকৃতি হচ্ছে গোপন বিনয় ও নম্রতা। আর ইবাদত হচ্ছে প্রকাশ্য বিনয় ও নম্রতা এবং অন্তরের স্বীকৃতির পরই এটি সম্ভব হয়। অন্যদিকে এই প্রকাশ্য বিনয় ও নম্রতা বিশ্বাসকে নির্জলা চিন্তার স্তর থেকে অন্তরের অন্তস্থলে স্থানান্তরিত করে। এর ফলে অনুভূতি ও চেতনার জগতে সে প্রবেশ করে এবং বিশ্বাস অন্তরকে উত্তাপ ও আলো সরবরাহ করে তার পরিচালক শক্তিতে পরিণত হয়।

এক ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব জানে এবং চিন্তাগতভাবে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর ঔজ্জ্বল্য ও নিয়ন্ত্রণ অনুভব ও উপলব্ধি করে, তাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে জানে এবং তাঁর সাথে নির্দিষ্ট সাক্ষাত ও তাঁর সামনে জবাবদিহির কথা মনে মনে কল্পনা করে। এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটি হচ্ছে অনুভব ও চেতনার অবস্থা। এই চেতনা বিশ্বাসের কাষ্ঠখন্ডকে জ্বালিয়ে তাকে খাদ্য পরিবেশন করে এবং নিজেও তার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাকে জীবিত রাখে এবং নিজেও তার সাহায্যে জীবিত হয়।

এ থেকে আমরা কুরআনে রসূলগণের অবস্থা ও তাঁদের রিসালাতের উৎস অনুসন্ধান করার পথের সন্ধান পাই। যদি আমরা এ ব্যাপারে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করি তাহলে ঈমান ও তওহীদের বিষয়কে আমরা সব সময় ইবাদতের অগ্রে দেখতে পাই। অন্য কথায় ঈমান ও তওহীদ সম্পর্কিত বিধান প্রকাশ্য ইবাদতের বিধানের অগ্রবর্তী। এক্ষেত্রে আমরা মূসা আ.-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। আল্লাহ তাঁকে প্রথম যখন নবী হিসেবে মনোনীত করেন তখন বলেন ঃ

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, কাজেই যে অহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগ সহকারে শোন। আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। কাজেই আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।'[২৮]

তওহীদকে ইবাদতের অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কারণ তওহীদ হচ্ছে মূল ও আসল এবং তওহীদ ছাড়া ইবাদত কায়েম হয় না।

মহান আল্লাহ ঈসা আ. সম্পর্কে বলেন ঃ

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.

'আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, তাঁর ইবাদত কর, এটি সরল সোজা পথ।' ২৯

এখানেও মৌখিক স্বীকৃতিকে ইবাদতের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ স. সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

لَاتَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً–وَقَضى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

'আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করো না। যদি কর তাহলে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। তোমার রব আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে।'৩০

এ আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্ট। কারণ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ না করাটাই যথার্থ তওহীদ। আর আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন মানে হচ্ছে, তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করার নির্দেশ দিয়েছেন।৩১ কারণ তিনি শরীকানা থেকে মুক্ত।

ঈমান ও ইবাদতের মধ্যে এটি একটি ন্যায়ানুগ বিন্যাস। কারণ ইবাদত হচ্ছে বিনত হওয়া এবং নম্রতা ও বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। ইবাদত হচ্ছে, মাবুদের শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিয়ে তাকে প্রাকৃতিক প্রবণতায় পরিণত করা এবং তাঁর নৈকট্যকে এমনভাবে অনুভব করা যেন মনে হবে তাঁকে একেবারে সে নিজের সামনেই দেখতে পাচ্ছে।

এ জন্য প্রথমে দরকার হচ্ছে মাবুদকে জানা। এর দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে, ঈমানের আলোকে অন্তর ভরে ফেলা এবং নিজের অনুভূতি ও প্রেরণার চাহিদা অনুযায়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ রহমানুর রহীমের অনুগত করা।৩২

আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যেকটি দীনেরই ইবাদত এসেছে তওহীদের পরেই। এভাবে ইবাদত আল্লাহর প্রতি ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। তওহীদের ব্যাপারে সমস্ত নবী ও রসূলগণ যেমন একই নীতির অনুসারী তেমনি তাঁদের ইবাদতের মূলনীতিও একই। কারণ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদত দুটো পৃথক জিনিস নয়, যদিও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ইবাদত পালনের রীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

নবী ও রসূলগণের তওহীদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে একই মূলনীতি অনুসরণের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি

নূহকে–আর যা আমি অহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমাদের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না।'[৩৩]

তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দীন প্রতিষ্ঠিত করার এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে মতভেদ করতে নিষেধ করেছিলেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, দীনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ যদি সবগুলো একই দীন না হয়ে থাকবে তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য না করতে বলাটা সঠিক হয় কেমন করে? আর যেহেতু আমরা আগের শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য ও মতভেদ দেখি শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখায় ও খুটিনাটি বিষয়ে, তাই দীন বলতে মূলত দীনের মূলনীতিই বুঝাবে অর্থাৎ যা স্থান-কালের অধীন হয় না। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এর মানে হচ্ছে-হে মুহাম্মদ ও নূহ! আমি তোমাদের দীনের বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছি অর্থাৎ দীনের এমন মূলনীতি যার ব্যাপারে শরীয়তের মধ্য কোন মতবিরোধ নেই। এগুলো হচ্ছে ঃ তওহীদ, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সৎকাজের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পূরণ, আমানত আদায় ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, যেকোন অবস্থায়ই হোক না কেন অকৃতজ্ঞ না হওয়া, হত্যা ও ব্যভিচার না করার এবং সৃষ্ট জীবকে কষ্ট না দেয়া।..... এগুলো সবই একই দীনের শরীয়ত এবং একটি মিল্লাতের অংশ। নবীদের সুন্নাতের মধ্যে এক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই, যদিও তাঁদের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৩৪]

ঈমানের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে ইবাদতের চারটি বুনিয়াদ। ঈমান ইবাদতের প্রয়োজন মুক্ত নয়। আবার ঈমানের অস্তিত্ব না থাকলে মূলত ইবাদত অনুষ্ঠিত হতে পারে না। যদি তেমন হয় তাহলে সবকিছু বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত হবে এবং এক প্রবল–ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনে বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ইবাদতের এই অস্তিত্ব জগতে মানুষকে তার আসল অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে দ্রুত স্বাদ গ্রহণ করার ও নিকটবর্তী লাভের ভাগী হবার প্রবণতা রয়েছে। এর বাইরে যা কিছু আছে তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। যখনই তার চেতনা ও জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং সে নিকটবর্তী সাময়িক লাভ ও দূরবর্তী চিরস্থায়ী লাভের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে তখনই দূরবর্তী স্থায়ী লাভের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী হয়। আর যখনই এমনটি হয় তখনই সে জৈব কামনা থেকে দূরে সরে নির্ধারিত মানবিক মানের উপরে উঠে যায় এবং আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।[৩৫]

এই বস্তু জগতে যে ব্যক্তি তার মহান অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হয় সে মানবতার উচ্চতর শ্রেণীর সত্য সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশী সচেতন হয় এবং সৃষ্টি জগতের জন্য তাদের চেয়ে বেশী কর্মতৎপর হয়।

আর ইবাদত মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়। এই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আনন্দ-সুখ এবং পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, জাতি-গোত্র, দেশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবার উপর এ সম্পর্ককে স্থাপন করে।
সে সম্পর্কের এ সমস্ত বলয় অতিক্রম করে সব সম্পর্ককে ঘিরে পৌঁছে যায়। এটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, হুকুমকর্তা ও ফায়সালাকারী আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক। এটি মানবতার পূর্ণতার উচ্চতম মর্যাদা। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় সে 'আবদুল্লাহ' এই উত্তম নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্যতা লাভ করে।[৩৬]
কাজেই স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পর্ক এবং অন্য কোন সম্পর্ক এর উপরে উঠতে পারে না। ঐ সম্পর্কগুলোর স্বীকৃতি দিতে নিষেধ করা হয়নি কিন্তু সেগুলো হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের তুলনায় ভিন্ন পর্যায়ের। কুরআন এ কথাই বলছে ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ.

'বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতে প্রিয় হয় তোমাদের বাপ, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসো, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।'[৩৭]

যে সব মানুষ নিজের চারপাশে কেবল খাবার-দাবার, পানীয় ও সুস্বাদু জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখে না তারা পশুর মতো। পশুর ক্ষুধা পেলে খাবার খাওয়া ও পানি পান করা ছাড়া নিজেদের জীবনের আর কোন অর্থই বোঝে না। এই শ্রেণীর মানুষরা তাই এই পশুদের সমতুল্য।

এদের মধ্য থেকে যারা পরিবার পরিজনদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়, তারপর নিজেদের জাতির ও দেশের জনগণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জেনে নেয়, তারা এদের থেকে উপরে উঠে যায়। তারা সমগ্র বিশ্বে নিজেদের অবস্থান জেনে নিয়ে সে সম্পর্কে সচেতন হয়। যে নির্ধারিত সময় ও কালের মধ্যে তারা জীবন যাপন করছে এবং ভবিষ্যতে যে অনন্তকাল তাদের জীবন যাপন করতে হবে, তার সীমারেখা সম্পর্কে তারা সচেতন।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্য ছাড়া মানুষ এই উন্নত মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে না। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, ঈমানই হচ্ছে আসল যার ভিত্তিতে দুনিয়ায় ও আখেরাতের জীবনে মানুষের প্রয়োজনে আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামনের দিকে আমরা ইবাদতের চারটি বুনিয়াদের প্রতিও সংক্ষেপে ইঙ্গিত করবো অর্থাৎ সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্জ।

প্রথম বুনিয়াদ সালাত

সালাত একটি ইবাদত। প্রত্যেক নবীর শরীয়তে এই ইবাদতটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি অন্তরে ঈমানের আলোকে শক্তিশালী করে এবং রাশিকৃত অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। নির্ধারিত সময়ে শরীয়তের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী সহকারে ইবাদত করার কারণে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে মানুষ দূরে থাকতে সক্ষম হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ

إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

'অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[৩৮]

সালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্য। জামায়াতের সাথে সালাত পড়ার মাধ্যমে এ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। এটি দীনের স্তম্ভ। যে একে কায়েম করেছে সে দীনকেও কায়েম করেছে এবং যে একে ধ্বংস করেছে সে দীনকে ধ্বংস করেছে। কুরআন ও হাদীসে এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ঈমানের পরেই সালাতের কথা এসেছে এটিই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। আর বিনীতগণ ছাড়া সবার জন্য এটি যথার্থই কঠিন।

সালাতের বিভিন্ন রুকন, শর্ত, কারণ ও নিষিদ্ধ কাজও আছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ও পূর্ণতা সহকারে সালাত পড়তে চায় তার জন্য এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি।

দীনের হেফাযতের ক্ষেত্রে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ

এ কারণে যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগ করে তার ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমে দেখতে হবে, সে সালাত পড়া ফরয এ কথা অস্বীকার করে কিনা। যদি সে এর ফরয হওয়া অস্বীকার করে তাহলে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ নেই। আর যদি সে কুড়েমির কারণে সালাত না পড়ে থাকে, তবে সালাত পড়া ফরয একথা বিশ্বাস করে, যেমন বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা, তাহলে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রথম যুগের পরবর্তীকালের অধিকাংশ ফকীহ, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী, এমত প্রকাশ করেছেন যে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে না তবে ফাসেক অবশ্যই হবে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অন্যথায় বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তির বিধান তার উপর জারী করে তাকে হত্যা

করা হবে। তবে পাথর নিক্ষেপে নয়, তরবারির সাহায্যে তাকে হত্যা করা হবে। প্রথম যুগের ফকীহগণের একটি দল এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সে কাফের হয়ে যাবে। আলী ইবনে আবূ তালেব থেকে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দুটি অভিমতের মধ্যে একটি অভিমত এ ধরনের আছে। শাফেয়ী ফকীহদের কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা এবং কুফাবাসীদের একটি দল ও শাফেয়ীদের মধ্য থেকে মাযানী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সে কাফের হয়ে যাবে না এবং তাকে হত্যা করাও হবে না বরং তার ওজর গ্রহণ করা হবে এবং তাকে কারারুদ্ধ করা হবে যে পর্যন্ত না সে সালাত পড়ে।[৩৯]

প্রথম দলটির যুক্তির ভিত্তি ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

'আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।'[৪০]

এ আয়াতটি এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাথে শিরকের বাইরে যে সমস্ত কাজ গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হয় সেই সব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর ক্ষমার বাইরে অবস্থান করে না।

২। আবু হুরাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কেয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথমে যে বিষয়টির হিসাব দিতে হবে সেটি হচ্ছে ফরয সালাত। যদি সে সালাত পূর্ণ করে থাকে তাহলে ভাল, অন্যথায় বলা হবে তার নফল ইবাদতের মধ্যে কিছু আছে নাকি দেখ? যদি তার নফলের মধ্যে থেকে কিছু পাওয়া যায় যা তার ফরযের কমতি পূর্ণ করতে পারে তাহলে তা দেয়া হবে। এভাবে অন্যান্য ফরয ইবাদতগুলোর ব্যাপারেও করা হবে।

৩। নবী স. আরো বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল, ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর নবী, যা তিনি মারয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর আদেশ এবং জাহান্নাম ও জান্নাত সত্য, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৪১]

৪। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মানুষের মধ্য থেকে সে-ই আমার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে।[৪২]

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হয়, সালাত পরিত্যাগকারী যদি সালাতের ফরয হওয়ায় বিশ্বাস করে তাহলে সালাত না পড়ার ফলে সে কাফের হয়ে যায় না। কারণ কাফের হয়ে গেলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের লক্ষ নির্ধারিত হতে পারে না। সে মাগফিরাত ও শাফায়াত লাভ করতে পারে না এবং জাহান্নামে চিরকাল

থাকার হাত থেকে নিষ্কৃতিও লাভ করতে সক্ষম হয় না। কারণ কাফের সর্বসম্মতভাবে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সে শাফায়াত ও মাগরিফাত লাভ করবে না। এখানে কুফর ছাড়া অন্য গুনাহর ব্যাপারেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।[৪৩]

সালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে তার সপক্ষে আল্লাহর বাণী উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاوةَ وَآتَوُا الزَكَاوْ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ.

'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে।[৪৪]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কেবলমাত্র তওবা করা তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর পর তাদের অবশ্যই সালাত কায়েম করতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে।

নবী স. বলেন, 'লোকেরা যতক্ষণ না লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয় এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় ততক্ষণ আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তারপর যখন তারা সেসব করবে তখন আমার হাত থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে, কেবলমাত্র ইসলামের হক ছাড়া। আর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে হবে তাদের হিসাব।[৪৫]

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ইন্তিকাল করার পর আরবদের মধ্যে ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) শুরু হলে উমর আবু বকরকে রা. বললেন, হে আবু বকর! আরবদের সাথে তুমি যুদ্ধ করবে কেমন করে? আবু বকর বললেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ 'লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।[৪৬]

এ হাদীস দু'টি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই কর্তব্যগুলোর যে কোন একটির যে বিরোধিতা করবে তার রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যাবে। কাজেই এই কর্তব্যগুলো পালন করার সাথে রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা জড়িত।

বলা যায়, উপরোক্ত আলোচনাগুলো 'আল্লাহর অনুগত বান্দা ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা'– এ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রদান করছে যেগুলোতে সালাত পড়া ফরয একথা বিশ্বাস করার পরও সালাত পরিত্যাগকারী কুফরীর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। আর এ শাস্তি হচ্ছে হত্যা অর্থাৎ সালাত পরিত্যাগকারীর কাজ কাফেরের কাজ পরিণত হয়।[৪৭]

দ্বিতীয় দলটির যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে ঃ

১। নবী স. বলেন, '(আল্লাহর অনুগত) ব্যক্তি ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।'[৪৮] এ হাদীসটি একথা প্রকাশ করে যে, সালাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে কুফরীর অপরিহার্য অংশ।

২। নবী স. বলেন, 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে সালাতের অঙ্গীকার। কাজেই যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে।'[৪৯]

তিনি আরও বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগ করে সে প্রকাশ্যে কুফরী করে।'[৫০]

এই দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাগণ সবাই জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে এই হাদীসগুলোর উপর আমল করেছেন। তাঁরা হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্য এবং এর মধ্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে তাঁদের যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন।

অন্য দিকে তৃতীয় দলটি প্রথম দলটির প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁদের কাফের না হওয়ার যুক্তি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হত্যা না করার হাদীস উপস্থাপন করেছেন। নবী স. বলেছেন, 'তিনটি অবস্থার কোন একটি ছাড়া মু'মিনের রক্তপাত হারাম। এক. বিবাহিত যিনাকারী, দুই. প্রাণের বদলে প্রাণ, তিন. দীন পরিত্যাগ করে দল থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভকারী।'[৫১]

এই তিনটি অবস্থা, এগুলো হচ্ছে ইসলামের হক। যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ স. তাঁর রসূল, তাদের কেউ উপরে উল্লেখিত তিনটি অবস্থার কোন একটির দায়ে অভিযুক্ত হলে তার রক্তপাত মুবাহ হবার ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত। এ তিনটি অবস্থার মধ্যে সালাত পরিত্যাগকারীর কথা বলা হয়নি। কাজেই হত্যা ওয়াজিব নয়। যদি ওয়াজিব হতো তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গে উল্লেখ করা হতো।[৫২]

হয়তো কেউ এর বিরুদ্ধে বলতে পারেন যে, এখানে সালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়নি। কারণ হাদীসে দীন পরিত্যাগকারী তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ দীন পরিত্যাগ করা বলতে কখনো দীনের অনুশাসনের বিরোধিতা বুঝায় আবার কখনো কুফরী ও অস্বীকার করাও বুঝায়। প্রথম দলটির বক্তব্য বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ কুফরী হচ্ছে অন্তরের ক্রিয়া। আর অন্তরের ঈমান সালাত পরিত্যাগ করার পর অবিচলিত আছে। সালাত পড়া ফরয এটা সে বিশ্বাস করতো। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে আল্লাহর এ বাণী ঃ

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيـمَانِ.

'তবে যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।'[৫৩]

কাফের না বলার ব্যাপারে তাদের সাথে তৃতীয় দলটির একাত্মতা তাদের বক্তব্যকে আরো জোরালো করে। আর হত্যার রায় যারা দিয়েছেন তাদের পক্ষে অবশ্য চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। তবে ব্যাপারটি ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যখনই আমরা বলবো, তাদের কেউ কেউ হত্যার রায় দিয়েছেন তখনই এই হত্যা হবে ভীতি প্রদর্শনের অর্থে, শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রবর্তনের অর্থে নয়। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যে বিধান সেটিও আমাদের এ অভিমত সমর্থন করে। কারণ যুদ্ধ করা ছাড়াই যদি তাদেরকে দমন করা যেতো তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে যাকাত আদায় করা যেতো এবং তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু যখন যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত ছাড়া তাদের উপর প্রতিপত্তি লাভ করা যাচ্ছে না তখন এ অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ হত্যাকে শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ বলা যাবে না। বরং একে বলা যাবে রক্তপাত। অনুরূপভাবে সালাত পরিত্যাগকারী যদি ভীতি প্রদর্শন করার পরও সালাত পড়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে প্রতিরোধকারী মনে করা হবে। এ অবস্থায় সে হবে প্রতিরোধ প্রবণতা ও প্রচেষ্টাসহ বিরত থাকা ব্যক্তি। এ অবস্থায় সে কঠিন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হবে এবং এ শাস্তি হবে হত্যা।[৫৪]

দ্বিতীয় বুনিয়াদ-যাকাত

ইসলামের গুরুত্ব ও এর স্তম্ভগুলোর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সালাতের পরে হলো যাকাতের স্থান। এটি একটি আর্থিক ইবাদত। কুরআনে বহু স্থানে একে সালাতের সাথে যুক্ত করে এবং বহুস্থানে সালাতের পরে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিশেষ নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে এ ইবাদতটি আদায় করা হয়। সেটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। দুনিয়ার নিয়ামিত দুই প্রকারের ঃ শারীরিক ও আর্থিক। দুনিয়ার নিয়ামতের শোকর আদায় করে আখেরাতে সওয়াব উপার্জন করার জন্য ইবাদতের প্রচলন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যে শরীরের নিয়ামত দান করেছেন সমস্ত শরীর দিয়ে যেমন তার শোকর আদায় করা হয় এবং এ শোকর হচ্ছে সালাত, ঠিক তেমনি যে সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন তার শোকরও আদায় করা হয় তারই অর্থাৎ ঐ সম্পদেরই অংশ থেকে। অভাবীকে অর্থ দান করার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হয়। আর এ নৈকট্য তখনই অর্জিত হয় যখন অর্থদানকারী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যেই অভাবীকে অর্থ দান করে। কাজেই সালাতের এক স্তর নিচেই হয় এর মর্যাদা।[৫৫]

যাকাত ফরয হয়েছে ধনীদের জীবন ও গরীবদের হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য। ধনীদের জীবন পরিশুদ্ধ করে কৃপণতা, লোভ ও লালসা থেকে এবং জুলুম ও অত্যাচারের আধিপত্য থেকে। অন্যদিকে গরীবদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করে হিংসা, বিদ্বেষ ও আক্রোশ থেকে, অভাবের তাড়নায় যা তাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এটা

যদি শুধু বাহ্যিক ক্রিয়া সর্বস্ব হয়ে থাকে তাহলে ধনীদের জন্য বহন করে আনে ক্ষতির পসরা। এই ফরযটি আদায়ের মাধ্যমে ইসলাম মুমিনদের দিল থেকে হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে উৎপাটন করে এবং তাদের ও এই সমস্ত মানসিক রোগের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। জামায়াত ও উম্মতের জীবনের জন্য এই সমস্ত রোগ থেকে হৃদয় ও মনের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক বিশ্বের ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে আমরা এই রোগগুলোর বিপুল ক্রিয়া লক্ষ করছি। এই সমস্ত রোগ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে সক্ষম না হলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না।

ইবনে আবদুস সালাম বলেন, কখনো দুটি কাজের কল্যাণ সবদিক দিয়ে সমান হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ যার জন্য অথবা যার উপর ঐ কল্যাণ ওয়াজিব করেছেন তার জন্য দু'টির মধ্যে থেকে একটি কল্যাণ আহরণ করা ওয়াজিব করে দেন। যেটি তিনি ওয়াজিব করেননি সেটির তুলনায় যেটি ওয়াজিব করেছেন সেটির প্রতিদান পূর্ণ করে দেন। কারণ নফল সাদাকার অর্থ এবং যাকাতের অর্থের মধ্যে কোন তফাত নেই। অথচ যাকাতটি তিনি ওয়াজিব করেছেন। কারণ যদি এটি না করতেন তাহলে ধনীরা গরীবদেরকে অর্থ প্রদান করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নিতো। এর ফলে গরীবরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আর অন্যদের দেবার তুলনায় এর প্রতিদান বেশী করেছেন যাতে তারা দিতে উৎসাহিত হয়।[৫৬]

যাকাত যখন ধনীদের আত্মা ও গরীবদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে, গরীবদের অভাব দূর করে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে তখন তা মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য কল্যাণে এবং দীনের বুনিয়াদী স্তম্ভে পরিণত হয়। কারণ দীনকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণার্থেই তৈরি করেছেন।

যাকাত ওয়াজিব হবার পরও যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তাকে হত্যা করা বৈধ। আর তাকে হত্যা করা হলে তার রক্তও হবে মূল্যহীন। কারণ সে আল্লাহ ও বান্দার প্রতি জুলুম করেছে। আর সে যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে সেই সাথে তাকেও হত্যা করা হবে। কারণ সে বিনা কারণে একজনকে হত্যা করেছে। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ আবু বকর যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তারা উটের গলার রশিটাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ স.-কে দিতো তাহলে তাদের এই অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।[৫৭]

তৃতীয় বুনিয়াদ-সওম

আল্লাহ যে শরীরের নিয়ামত দান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য সওম ফরয করেছেন। কিন্তু এর মর্যাদা সালাতের চাইতে কম। সালাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শামিল হয়, সওমে তা হয় না। বরং সওমে কেবলমাত্র দু'টি দৈহিক

কামনাকে তাদের অবাধ বিচরণ থেকে বিরত রাখা হয়। তাদের একটি হচ্ছে পেটের কামনা এবং অন্যটি যৌনাঙ্গের। যে নফস স্বাদ ও কামনাপূর্তির নেশায় মত্ত থাকে তার মাধ্যমেই এই সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই নফস হচ্ছে অসৎ প্রবণতামুখী আত্মা। কুরআনে আল্লাহ তাকে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। কামনার চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রেখে তাকে আল্লাহর মর্জিমত চলার ব্যবস্থা করেছেন। এটিই সৎকর্ম তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভ।[৫৮]

সওমের ফলে মানুষ যে সুবিধাটা লাভ করে তা হচ্ছে এই যে, তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা একটা অনুশীলনের মাধ্যমে দৃঢ় সংকল্পের উপর স্থান লাভ করে এবং স্বাদ ও কামনা এমন মুবাহ্ কাজগুলোর ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তিও তাকে দান করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখার জন্য তার ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করে। এই সাথে মানুষ তাকওয়া ও আনুগত্যের নিকটবর্তী হয়। যেমন আল্লাহর বাণী থেকে প্রকাশিত হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সওমের বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।[৫৯] এভাবে সওম তাকওয়ার কারণে পরিণত হয়। আর তাকওয়া আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে অবস্থান করে তাঁর আনুগত্য করার কারণ হয়, ফলে মানুষের পক্ষে সালাত পড়া, যাকাত দেয়া এবং এ ছাড়া অন্যান্য ওয়াজিব ও বৈধ কাজগুলো সহজ হয়।

চতুর্থ বুনিয়াদ-হজ্জ

হজ্জ হচ্ছে আল্লাহর মহিমান্বিত ঘর যিয়ারত করা। আর এটি হিজরত তথা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার মাধ্যমে আদায় করা হয়। এ জন্য কয়েকটি বড় বড় অপরিহার্য কাজ করতে হয় বিশেষ সময়ে ও বিশেষ স্থানে। এর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে বিষয়টি আছে তা আসলে এই বিশেষ সময় ও স্থানগুলোকে মর্যাদা প্রদান অর্থেই নির্ধারিত হয়েছে।[৬০]
আল্লাহ এ বিষয়টি এভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

'মানুষের মধ্যে যার সে গৃহ অভিমুখে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।'[৬১]

হজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম রুকন তথা স্তম্ভ এবং তার বৃহত্তম ও মহত্তর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ইসলামী দলগুলোর পরিচিতি, তাদের পারস্পরিক অবস্থা অনুসন্ধান এবং দীন ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় ইত্যাদি ব্যাপারে তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। সফরের ফলে হজ্জযাত্রীদের নিজস্ব পর্যায়েও অনেক লাভ হয়। সামর্থবানদের উপর সারা জীবন এক বার হজ্জ করা ফরয করা হয়েছে।

সামর্থ্যের ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়েছে।৬২ হজ্জের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রুকন, শর্ত, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কার্যক্রম। আবার কিছু কাজ এমন আছে যা করলে হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়। হজ্জকে সঠিকভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার জন্য এগুলো জানা অপরিহার্য।

এগুলো ইবাদতের চারটি বুনিয়াদ এবং ইসলামের চারটি স্তম্ভ। আল্লাহর প্রতি ঈমান এদের সবার উপরে অবস্থান করেছে। আর এটি হচ্ছে সমস্ত সৎ কাজের শাখা প্রশাখার কাণ্ড ও মূল, সেগুলোর সঠিক হওয়া ও আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়ার শর্ত এবং এর ভিত্তিতে আখেরাতের জীবনে সওয়াব নির্ধারিত হবে।

এ ইবাদতগুলো বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কল্যাণ দুনিয়ায় ও আখেরাতে ব্যক্তি ও সমাজের দিকেই ফিরে আসবে।

এই ইবাদতগুলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় কল্যাণ ও সাফল্যের প্রাণ প্রবাহ, ভরে দেয় তাদের অন্তর ঈমানের আলোয় ও আল্লাহ ভীতিতে। দূরত্ব সৃষ্টি করে তাদের ও অশ্লীল অসৎ কাজের আবর্জনা স্তূপের মধ্যে, পবিত্র করে তাদের হৃদয় ও আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা থেকে। সেখান থেকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বের করে নিয়ে প্রেম-প্রীতি দয়া-মমতায় ভরে তোলে সমস্ত অন্তর। শেষ পর্যন্ত তারা এক দেহে পরিণত হয় এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে নিজের ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করতে শুরু করে। তাদের ব্যক্তির মানসিক সংকল্পকে দৃঢ়তর করে, যার ফলে তারা বড় শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ বড় শত্রু হচ্ছে অসৎ প্রবণতাবাহী নফসে আম্মারাহ। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমের বিশাল ব্যবধানের মধ্যে যোগাযোগ পরিচিতি ও সহযোগিতা।

এই ইবাদতগুলো আবার ব্যক্তি ও দলের জীবনের যাবতীয় উন্নততর নৈতিক প্রয়োজন যেমন সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ন্যায়পরায়ণতা, অঙ্গীকার পালন এবং অন্যান্য মানবিক আচরণ ইত্যাদি পূরণের মাধ্যম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকেও এগুলো তাদেরকে রক্ষা করে। কারণ এগুলো তাদের অন্তর ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে এবং তাদেরকে এমন সব রোগ থেকে দূরে রাখে যেগুলো ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টির সহায়ক।

আর একারণে এগুলো উন্নততর কল্যাণ তথা দীনের কল্যাণ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণেই এগুলো দীনের স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এগুলোর উপরই দীনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। যেমন নবী স. বলেছেন ঃ 'পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ কায়েম করা হয়েছে ঃ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ও রমযানের সিয়াম সাধনা করা।৬৩

ইসলামের এই স্তম্ভগুলোই আল্লাহর নিকট দীন হিসেবে গৃহীত। বুনিয়াদ ও স্তম্ভ ছাড়া কোন অট্টালিকা গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের অন্যান্য আচরণগুলো এই অট্টালিকার চূড়ান্তরূপ দিতে সহায়ক। এদের কোন একটির অনুপস্থিতিতে অট্টালিকা ত্রুটিপূর্ণ হয়। তবে অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর এই ত্রুটি তাকে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। অন্যদিকে উল্লেখিত পাঁচটি বুনিয়াদে ত্রুটি থাকলে অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এগুলোর অনুপস্থিতিতে ইসলাম তখন খতম হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। অনুরূপভাবে দুটি শাহাদাত তথা সাক্ষ্য না পাওয়া গেলেও ইসলাম খতম হয়ে যায়। এই শাহাদাত দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস। এ সাক্ষ্য দু'টি থাকার পর যদি অন্য চারটি বুনিয়াদ অনুপস্থিত থাকে তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইতোপূর্বে সালাত পরিত্যাগ করার আলোচনায় আমরা এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছি।

এই পাঁচটি বুনিয়াদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। নবীর স. একটি বাণীতে এরই প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে ঃ

الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة ولانار والحياة بهد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والز كاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالز كاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج و لم يوصى بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التى قبلها.

'পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে দীন গঠিত। এদের একটি ছাড়া অন্যটি আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। সাক্ষ্য দেয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি এবং জান্নাত, জাহান্নাম ও মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি ঈমান আনা। এগুলো সব মিলিয়ে একটি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দীনের স্তম্ভ। সালাত ছাড়া আল্লাহ ঈমান কবুল করবেন না। আর যাকাত গুনাহ থেকে পবিত্র করে। আল্লাহ ঈমান ও সালাত গ্রহণ করবেন না যাকাত ছাড়া। যে ব্যক্তি এ তিনটি করলো তারপর রমযান এলো এবং সে জেনে বুঝে সওম পরিত্যাগ করলো, আল্লাহ তার ঈমান, সালাত ও যাকাত কবূল করবেন না। যে ব্যক্তি এ চারটি করলো এবং তারপর হজ্জ করার সুযোগ এলো কিন্তু সে হজ্জ করলো না, কাউকে হজ্জ করার অসীয়তও করলো না এবং তার পরিবারের কেউও তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলো না, এ ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে সে যে চারটি কাজ করেছিল আল্লাহ তা কবূল করবেন না।[৬৪]

এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন উসমান ইবনে আতা খুরাসানী তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে। ইবনে আবু হাতেম এটি উল্লেখ করেছেন– তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, এটি 'মুনকার' হাদীস।[৬৫] এটি আতা খুরাসানীর বক্তব্য হবারও সম্ভাবনা আছে। আমার মতে, বাহ্যত এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আতা হচ্ছেন সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অন্যতম।[৬৬]

হাদীসটিতে 'ইনকার' বা 'যঈফী' যাই থাক না কেন এটি যে পূর্ণতার অর্থ প্রকাশ করেছে সে ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। কারণ এই স্তম্ভগুলোকে আল্লাহ একটি মাত্র সত্যকে পূর্ণতা দান করা ছাড়া অন্য কোন কারণে ওয়াজিব করেননি। আর সেই সত্যটি হচ্ছে দীন। আল্লাহ দীনকে যে আকৃতিতে গঠন করেছেন তার প্রকৃত সত্তার অস্তিত্বের জন্য এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হওয়া একান্ত জরুরি। অন্যথায় তা ক্রটিমুক্ত হবে না এবং কামালিয়াত বা পূর্ণতা লাভ করবে না।

এভাবে আমরা দীনের কল্যাণের জন্য মানুষের দ্বিতীয় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়ে থাকি। কারণ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানের কল্যাণকে তার সমস্ত কল্যাণের শীর্ষে স্থান দিয়েছি। তারপর স্থান দিয়েছি অপরিহার্য ইবাদতগুলোর কল্যাণকে। এগুলোকে অন্যান্য ইবাদতগুলোর ভিত্তিভূমি মনে করা হয়েছে, যেগুলো শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। এগুলো হচ্ছে 'মানদুব' তথ্য বৈধ ইবাদতসমূহের কল্যাণ। আর দীনের কল্যাণ ধীরে ধীরে ঈমান থেকে পৌছে যায় জনপথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত। যেমন নবী স. বলেছেন ঃ ঈমান সত্তরোর্ধ বা ষাটোর্ধ শাখায় বিভক্ত। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতমটি হচ্ছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলা এবং নিম্নতমটি হচ্ছে জনপথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা।[৬৭]

দীনের কল্যাণের তৃতীয় অবস্থান

এ অবস্থানটিকে দ্বিতীয় অবস্থানের অধীন এবং তাকে পূর্ণকারী মনে করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, আনুগত্যমূলক কর্মকাণ্ডগুলো সালাত পড়া, অর্থ দান করা, সওম রাখা বা হজ্জ করার মধ্যে বিভক্ত। এগুলো করা ফরয হবে অথবা ফরয হবে না। যদি এগুলো ফরয হয় তাহলে এগুলোর আলোচনা সামনের দিকে চলবে। আর যদি ফরয না হয় তাহলে ফরযের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য তার অধীন হবে।

কাজেই সমস্ত নফল সালাত ফরয সালাতের অধীনে তাকে পূর্ণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার বলয়ের মধ্যেই হবে তাদের অবস্থান। কেয়ামতের দিন ফরয সালাতের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা দিলে এই নফল সালাতগুলো তাকে পূর্ণতা দানে সাহায্য করবে। নবী স.-এর একটি বাণীতে একথা সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك

'কেয়ামতের দিন বান্দা সর্বপ্রথম ফরয সালাতের হিসাবের সম্মুখীন হবে। যদি সে তা পূর্ণ করে থাকে এবং তার পুরোপুরি হিসাব দিতে পারে তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় বলা হবে দেখো, তার কোন নফল সালাত আছে কিনা। যদি তার এমন নফল থেকে থাকে যা ফরযকে পূর্ণ করতে পারে তাহলে তা করা হবে। এরপর তার সমস্ত ফরয আমলের সাথে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।[৬]

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নফলগুলো ফরযগুলোর উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। সব রকম নফলের ব্যাপারে এই একই কথা। অন্য কোন কারণে অর্থ দান করাকেও ফরয যাকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণতা দানকারী বলে বিবেচিত হবে। কখনো নফল সালাতের মতো নফল সাদাকাও কেয়ামতের দিন এ হিসেবে বিবেচিত হবে, আবার কখনো দুনিয়াতেও। কারণ যাকাত যদি গরীব-মিসকিনদের অভাব দূর করতে না পারে তাহলে ধনীদের থেকে যাকাতের বাইরে অন্যান্য সাদাকার অর্থ সংগ্রহ করে গরীবদের অভাব পূরণ করা হবে। কারণ সম্পদে রয়েছে যাকাতের হক। এ থেকে আমরা যে পথ নির্দেশনা পাই তা হচ্ছে এই যে, নফল সাদাকার সাহায্যে অর্থদানের মাধ্যমে ফরয যাকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে, যা শুধুমাত্র বছরে একবার ঘুরে ফিরে আসে এবং তা নির্ধারিত হয় অভাবীদের অভাব পূর্ণ করে তাদের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন এবং দীনের একটি স্তম্ভ হিসেবে দীনকে পূর্ণতা দান করার জন্য। সওম ও হজ্জের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা হয়। প্রত্যেকটি সৎ ও আনুগত্যমূলক নফল কাজ এই চারটি বুনিয়াদের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলোর অবস্থান হবে একই ছায়া তলে।

৩৭। সূরা আত তওবা-২৪ আয়াত।
৩৮। সূরা আল আনকাবুত-৪৫ আয়াত।
৩৯। নাইলুল আওতার-১ম খণ্ড-৩৪ পৃষ্ঠা।
৪০। সূরা আন নিসা-৪৮।
৪১। নাইলুল আওতার-১ম খণ্ড-৩৪৬ পৃষ্ঠা এবং বুখারী ও মুসলিম।
৪২। বুখারী এবং নাইলুল আওতার-১শ খণ্ড-২৪৬ পৃষ্ঠা।
৪৩। নাইলুল আওতার-১ম খন্ড-২৪৭ পৃষ্ঠা।
৪৪। সূরা আত তওবা-৫ আয়াত।
৪৫। নাসাঈ ও নাইলুল আওতার।
৪৬। বুখারী ও মুসলিম এবং নাইলুল আওতার-১ম খণ্ড-২৪৫ পৃষ্ঠা।
৪৭। নাইলুল আওতার-১ম খন্ড-৩৪১ পৃষ্ঠা
৪৮। বুখারী ও নাসাঈ ছাড়া একদল মুহাদ্দিস তাদের গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।
৪৯। সিহাহে সিত্তার একজন ছাড়া পাঁচজন এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নাইলুল আওতার ১ম খন্ড-৩৪৩ পৃষ্ঠা।
৫০ তাবারানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।
৫১। বুখারী ও মুসলিম।
৫২। জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম-১০৬ পৃষ্ঠা।
৫৩। সূরা আন নাহল-১০৬ আয়াত।
৫৪। শওকার্নি, নাইলুল আওতার-৪র্থ খণ্ড-১৩৫ পৃষ্ঠা।
৫৫। উসূলুস সারাখসী ২য় খণ্ড-২৯১ পৃষ্ঠা।
৫৬। কাওয়ায়েদুল আহকাম-১ম খণ্ড-২৯ পৃষ্ঠা।
৫৭। শওকানী, নাইলুল আওতার-৪র্থ খণ্ড-১৩৪ পৃষ্ঠা।
৫৮। উসূলস সারাখসী-২য় খণ্ড-২৯১ পৃষ্ঠা।
৫৯। সূরা আল বাকারা-১৮৩ আয়াত।
৬০। সারাখসী, উসূলুল ফিকহ-২য় খণ্ড-১৯১ পৃষ্ঠা।
৬১। সূরা আল ইমরান-৯৭ আয়াত।
৬২। নাইলুল আওয়ার ৪র্থ খন্ড-৩২২ পৃষ্ঠা।
৬৩। বুখারী ও মুসলিম।
৬৪। জামেউল উলম ওয়াল হিকাম-৩৯ পৃষ্ঠা।
৬৫। কোন যঈক রাবীর হাদীস অপর কোন যঈক রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত বেশী যঈফ হাদীসটিকে 'মুনকার' বলা হয়। 'ইনকার' হাদীসের ক্ষেত্রে একটি মস্তবড় দোষ। অনুবাদক।
৬৬। জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম-৩৯ পৃষ্ঠা।
৬৭। মুসলিম, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাস-২৪ পৃষ্ঠা।
৬৮। সিহাহে সিত্তার মধ্য থেকে পাঁচটি হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং নাইলুল আওতার-১ম খণ্ড-৩৪৫ পৃষ্ঠা।

- অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০৭-১২৬

ইসলামী ফিক্হ এর গুরুত্ব ঃ একটি আলোচনা

মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম

ভূমিকা ঃ সর্বস্তরের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করাই হচ্ছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ধর্মে সকলের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এজন্য শরীয়তের বিধানগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত ইসলাম কোন প্রকার কঠোরতা অথবা লাগামহীন সহজীকরণ থেকে মুক্ত। এজন্য বহু চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়েও এর শ্বাশত বিধানগুলো অদ্যাবধি প্রাণ বন্ত রয়েছে। কোন অপশক্তি নির্বাপিত করতে পারেনি ইসলামের আলো। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সার্বিক উপকরণের উন্নতির জোয়ারে উদ্ভাবিত নব নব সমস্যার সমাধানে ব্রতী ইসলামী ফিক্হ।

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে গঠিত ইসলামী ফিক্হ। ইসলামী ফিকহ আধুনিক যুগের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কোন যুগ বা দেশের গণ্ডির মধ্যে ইসলামী ফিক্হ আবদ্ধ নয়। তদ্রুপ শুধু ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইবাদতের মধ্যেও ইসলামী ফিক্হ আবদ্ধ নয়। শিল্প বিপ্লব-উত্তর যুগেও এর দ্বারা যেমন প্রয়োজন মেটানো যেতো, আজও একই ধারাবাহিকতায় ইসলামী ফিক্হ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইসলামী ফিকহ যুগের চাহিদা কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে মেটাবে এবং মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের পদ্ধতিগত পরিবর্তন ও সংযোজনের সম্যক বিবরণ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যুগের চাহিদানুযায়ী ইসলামী ফিকহ এর সকল অধ্যায়ই কি পরিবর্তন যোগ্য কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হুকুমের ব্যাখ্যা কী হতে পারে আলোচনায় এর জবাব রয়েছে। ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভিন্ন মাযহাব থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী ফিকহ এর আইন পরিবর্তনের ভিত্তি কী হবে, ইত্যাকার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

ইসলামী ফিক্হ এর ব্যাপকতা

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনের কোন প্রান্তই এর ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সব

লেখক : সরকারী কর্মকর্তা। পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, জাতিগত সম্পর্ক ও নিরাপত্তা, দুর্নীতি দমন, নৈতিকতার মান উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক এবং কল্যাণধর্মী সব কর্মকাণ্ডের বিধিবিধান এতে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের শাখা-প্রশাখাসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ অত্যন্ত সমঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ইসলামী ফিক্‌হে। কোন ব্যক্তি এসকল বিধানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া মাত্রই তার মনে এ ধরনের দ্বিধার সৃষ্টি হবে না যে, ইসলাম লোক সমাজের অন্তরায়, বহিরাঙ্গন ও সামাজিক সমস্যার কোন সমাধান এতে নেই।

ইসলামী বিধানের চিরন্তনত্ব

ইসলামের কল্যাণ কোন বিশেষ সময় বা যুগের সাথে নির্দিষ্ট নয়। আজ থেকে পনের শত বছর পূর্বে ইসলাম যেভাবে তৃষ্ণার্ত মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল, শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছিল, নরখাদক ও রক্তপায়ীদেরকে মনুষ্যত্বের রক্ষক ও পাহারাদার বানাতে সক্ষম হয়েছিল, সেই ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের ছায়ায় সর্বদাই শান্তি। সর্বদাই মানবতার মুক্তি। শান্তির সেই ধর্মই আল্লাহর দীন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দীন বা জীবনব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম।'[১]

অন্য কোন দীন বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন, ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'[২]

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ করি, তাহলে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে যে, ইসলামের আইন-কানূন দ্বারাই পৃথিবীর বিরাট অংশ পরিচালিত হয়েছিল। অগণিত সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তন, জ্ঞানের পরিধিতে বিপ্লব সৃষ্টি, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রুচিহীন জাতিকে সংস্কৃতিশীল, অসভ্য জাতিকে সভ্য ও কৃষ্টিশীল জাতিতে পরিণত করেছিল। এক সময় ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, নব নব আবিষ্কারের নেতৃত্ব দিয়েছে। অথচ বর্তমানে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, ইসলাম (Out of Date) আধুনিক যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম, বিজ্ঞানের উন্নতির পরে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় ইসলামকে টেনে আনা জ্ঞানের দাবি নয়। তবে এসব জ্ঞানপাপীরা আবার ইসলামের পক্ষে একটু দরদও দেখান। তারা বলেন, যেহেতু ইসলাম আল্লাহর ধর্ম, তাই তাকে পবিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। মসজিদের মান-মর্যাদা রাখতে হবে এবং যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী বা উপাসনাকে সম্মান দেখাতে হবে। কোন অবস্থাতেই এতে বাধা প্রদান করা যাবে না। তারা কিছু ইবাদত ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ রেখে বাকি সমস্ত কিছুতে নিজেদের দখল রাখতে চায়।

আধুনিকতার চাকচিক্য ও ধ্বংসযজ্ঞ

পাশ্চাত্যবাদীরা ইউরোপীয় সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতিকে দেখিয়ে এর মোকাবিলায় ইসলামকে যেভাবে অকার্যকর প্রমাণ করতে চান, সেভাবে মুসলমানদেরকে তার জবাব প্রস্তুত রেখে শত্রুদের মোকাবিলার জন্য বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করতে যথেষ্ট পরিমাণে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হবে তাদের সেই উন্নতি, অগ্রগতি ও বেহায়াপনার সংস্কৃতিকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতির কথা শুনে যারা ধাঁধায় পড়ে যান, তাদের চিন্তা করা উচিত, কী উন্নতি করেছে তারা ? শান্তিতে, ভ্রাতৃত্বে, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায়, মানবতাবোধে, না আখেরাতের নাজাতে ? তারা যেসব বিষয়ে উন্নতি করেছে তা দিয়ে উক্ত বিষয়গুলোর কোনটি তারা দিতে পেরেছে ? তাদের এসব উন্নতি কতটা মানব কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে ? তারা মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে ? পারেনি। কারণ তাদের উন্নতি মানুষের কল্যাণের জন্য হচ্ছে না। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য এসব ব্যয়িত হচ্ছে। গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো প্রযুক্তিতে তারা উন্নতি করেছে। প্রতিমুহূর্তে তৈরী করছে অত্যাধুনিক হাতিয়ার শুধু মানুষকে মারার জন্য। অবাধ যৌনাচার, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনাকে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার মিডিয়া প্রযুক্তি বের করেছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে ব্যভিচার, ধর্ষণ, মাদকতার মাতলামি, খুন ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। এমন একটি সেকেন্ড যায় না, যখন কেউ না কেউ খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি বা চুরির শিকার না হচ্ছে। সাথে সাথে এইড্‌সসহ মহামারির মতো অত্যাধুনিক (?) রোগও রফতানি হচ্ছে।

মূলত এসব কর্মকাণ্ডের বাধা হয়ে আছে শুধু ইসলাম। আর কেউ এতে বাধা দিচ্ছে না। তাই ইসলামকে ঠেকাতে হবে। সরাসরি বলাও যাবে না যে, ইসলাম এসব করতে দিচ্ছে না। তাই বলতে হবে, ইসলাম প্রগতির জন্য বাধা হয়ে আছে। অথচ ইসলাম প্রযুক্তি বা উন্নতি বিরোধী নয়। মানব কল্যাণে যত আবিষ্কার আছে তার সবগুলোকে ইসলাম স্বাগত জানায়। কিন্তু মানবতার ধ্বংসের জন্য পারমানবিক বোমাসহ অপব্যয়কে ইসলাম ঘৃণা করে। কারণ এসবের দ্বারা মানুষ তো উপকার পাচ্ছেই না, বরং এর দ্বারা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়া হচ্ছে। মানুষের ধ্বংসের জন্য এসব খাতে যত ব্যয় করা হয়, তা যদি মানব খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যয় করা হতো, তবে পৃথিবীতে একটি মানুষকেও না খেয়ে থাকতে হতো না। তাই আমরা বলতে পারি শুধু উপকরণের উন্নয়ন নয়; বরং নৈতিকতা ও মানসিকতার উন্নয়ন আগে অপরিহার্য। কারণ নিজের ব্যক্তিত্ব, সম্পদ ও সম্মানের অধিকারগুলো নিশ্চিত সুরক্ষা করা হচ্ছে মানুষের স্বভাব। এ বিষয়গুলো শত্রুর চোখের শূল হয়ে দাঁড়ায়। এককালে মানুষ এগুলো সংরক্ষণের উপকরণ হিসেবে বাঁশ-লাঠি, পাথর ব্যবহার করত। এরপর যখন মানুষের মধ্যে নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হলো এবং লৌহ ব্যবহারের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করল, তখন একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তীর-বল্লম ও তরবারী আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে শুরু করল। এভাবে মানুষের

প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহার উপকরণ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এমন উন্নতির শিখরেউপনীত হয়েছে, যেকোন মুহূর্তে গোটা মানবজাতি এমনকি সারা পৃথিবীকে ধ্বংসলীলায় পরিণত করতে সক্ষম। পরিবর্তনের এ ধারাবাহিকতায় যুদ্ধাস্ত্র ও এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অস্বাভাবিক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এবং স্বভাবে আজও কোন পরিবর্তন হয়নি। এভাবে অন্যান্য উন্নীত বিষয়গুলোর প্রতি গবেষণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একই ফলাফল বেরিয়ে আসবে। তা হচ্ছে- উপকরণের উন্নতি। ইসলাম শরীয়তের মূল বিষয় কিন্তু উপকরণ বা মাধ্যম নয় বরং মানুষ ও তার স্বভাব। তরবারী ও অন্যান্য বিধ্বংসী বস্তু বিষয় নয়; বরং মানুষের প্রতিরক্ষার মূল স্পৃহাকে একটি ন্যায়সঙ্গত অবস্থানে এনে পরিচালনা করা। অবস্থানের ভিত্তিতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্রগামী কিংবা স্থবিরতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা। পৃথিবীতে যত উপকরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তীব্র হুমকী অনুভূত হচ্ছে।

ইসলামী আইন-কানূনের চিরন্তনত্ব ও উপকারের মূল কথা হচ্ছে কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড ও মানুষের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান। যা গ্রহণ করার যোগ্যতা মানুষ পুরোপুরিভাবে রাখে। ইসলামে এমন কোন বিধান নেই, যা বিবেক বর্জিত ও কল্যাণের পথে বাধা এবং বিজ্ঞতা ও নিপুণতার পরিপন্থী। ইসলামী শরীয়তে এমন কিছু বিধান রয়েছে যা সর্বসাধারণের বিবেক গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। পণ্ডিতগণ এমন বিষয়গুলোকে আল্লাহ তা'আলার আদিষ্ট বিষয় 'ইবাদত' হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এজন্য ইবাদতের সম্পৃক্ততা বান্দার সাথে করা হয়েছে। যেখানে চিন্তা-গবেষণা ব্যতীতই নিজের আপাদমস্তক আল্লাহর সান্নিধ্যের জন্যে অবনত করা হয়। এটিই আনুগত্যের মূল। তবে একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, উক্ত পদ্ধতির ইবাদতগুলো বিবেকবর্জিত বরং আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে এর মাহাত্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন যে, ইসলামী শরীয়ত বিবেককে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। যার কারণে ফক্বীহগণ শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে 'বিবেক সম্মতকে মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো বিবেক শরীয়তের অধীনে থাকবে। শরীয়তের বিধানসমূহে কিংবা কোন বিষয়ের ভালো-মন্দ, উপকারী বা অপকারী বিষয়াদির মানদন্ড প্রসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে মূলতঃ তিনটি দল রয়েছে এক. মু'তাযিলা। এদলের বক্তব্য হচ্ছে সকল বস্তুর ভালো-মন্দের যাচাই ও মীমাংসার ক্ষমতা বিবেকের। শরীয়ত বিবেকের সাথে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

দুই. আশাইরাহ। তাদের নিকট কোন বস্তুর নিজস্ব ভালোমন্দের যোগ্যতা নেই; বরং শরীয়তের বিধান মোতাবিক ভালো-মন্দ নির্ণীয় হবে। তাহলে বোঝা গেল এদলের বক্তব্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলীতে বিবেকের কোন কার্যকারিতা নেই।

তিন. মাতুরিদিয়্যাহ। এ দলটি একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। তা হচ্ছে যে, ভালো-

মন্দ যাচাইয়ের ব্যাপারে বিবেকের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তবে বিবেক শরীয়তের হুকুমের অধীন। এজন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি শরীয়তের কোন হুকুম বিবেক ও অনুভূতির বিরুদ্ধ হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিবেক ধর্তব্যহীন হয়ে যায়; বরং শরীয়তের হুকুমের অনুসরণ করতে হয়। তবে বুঝতে হবে এ হুকুম বিবেকবর্জিত নয়, বরং বিবেক অনুযায়ী আঁচ করা অক্ষম। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেছে যে, বিবেক শরীয়তের হুকুমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে না। ইমাম শাতেবী যথার্থই বলেছেন ঃ 'যদি শরীয়তের হুকুমের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণের প্রাধান্য বিবেকের থাকত, তবে পূর্ণ শরীয়তই অগ্রাহ্য হত। আর এটি অবাস্তব।'[৩]

ইসলামী আইন স্থবির নয়

কিছু কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলোতে মানুষের কল্যাণের ব্যাপারটি পরিবর্তনশীল। ইসলামী ফিক্‌হ্ শাস্ত্র এমন গতিশীল যে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা, দৈনন্দিন জীবন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়সহ সকল সমস্যার সময়োপযোগী সমাধানের পথ ইসলামী আইনে রয়েছে। এ বিষয়গুলো আল কুরআন, আল হাদীসসহ প্রামাণ্য চতুষ্টের আলোকেই সমাধান বের করা হয়। হাফিয ইবন কায়্যিম র. (মৃ. ১৩৫০ হিঃ) স্বীয় 'ই'লামুল মুয়াককি'ঈন' গ্রন্থে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে লিখেছেন ঃ পরিভাষা, অভ্যাস-বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, ভাষা ও স্থানের ভিন্নতায় ইসলামী আইনে পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়ে জনসাধারণ অজ্ঞতার কারণে অনেক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। অথচ শরীয়তের ভিত্তিই হচ্ছে মানব কল্যাণ।

যদি কোন আইন ইনসাফের গণ্ডি থেকে বের হয়ে অন্যায় ও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পর্যবসিত হয় কিংবা করুণার পরিবর্তে দুঃখ-কষ্ট, কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ, প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে পড়ে, তখন এসব অধঃপতিত আইনকে শর'ঈ আইন সাব্যস্ত করার আদৌ অবকাশ নেই।'[৪]

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহবিদ আল্লামা কিররানী র. বলেন ঃ

'সর্বক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের বর্ণিত বিধানের উপর অনড় মনোভাব পোষণ করা মূলতঃ ধর্মের মধ্যে ভ্রষ্টতা এবং মুসলিম পূর্বসূরীদের উদ্দিষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করে।'[৫]

তুর্কিস্তানে খিলাফতে উসমানিয়্যার শাসনামলে রচিত ইসলামী আইন সম্বলিত 'মাজাল্লাতুল আহকাম' গ্রন্থে ফিকহী মাসআলা এর স্বতন্ত্র একটি মূলনীতি তৈরী করেছেন। তা হচ্ছে - 'কালের বিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন অনস্বীকার্য নয়।'[৬]

আল্লামা শামী র. যথার্থই লিখেছেন, 'অনেক বিষয়ের এমন সব বিধান রয়েছে যুগের বিবর্তনে যার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হয়। কারণ প্রত্যেক যুগেই মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তন হয়, নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এতে উদ্ভূত নতুন সমস্যাগুলোতে শরীয়তের পূর্ব নির্ধারিত হুকুম প্রয়োগ হলে মানুষের ভুগান্তি দিন দিন বেড়েই যাবে। ইসলামী শরীয়তের

মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা।'[৭] নতুন সমস্যার ফিকহী সমাধান এবং দুনিয়ায় পরিবর্তিত রীতি-নীতিগুলো ইসলামী আইন-কানূনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। পৃথিবীর সামনে সর্বজনীন ও শাশ্বত ধর্ম ইসলামের হুকুমগুলো এভাবে পেশ করতে হবে যাতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

হযরত উমর রা.-এর ইজতিহাদ পদ্ধতি

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যখনই মুসলমানরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তখনই বিজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী স.-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র হিজায ও এর আশ-পাশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত আবুবকর রা.-এর খিলাফতকালে কিছু লোক মিথ্যা নবুয়ত দাবি করে। আর কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। আবু বকর রা. আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের দমনে সক্ষম হন। হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন রাজ্য বিজিত হয়। বিশেষ করে সে সময়ের দুই পরাশক্তি রোম ও ইরান ইসলামেরর ছায়াতলে আসে। ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র এমন দু'টি দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়, যার সাথে ইতোপূর্বে পরিচয় ছিল না। এ সময় অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। ব্যক্তিগত পর্যায়েও সাহাবীগণ সমস্যার সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় হযরত 'উমর রা. সরকারীভাবে একটি কমিটি গঠন করেন, যারা উদ্ভূত নতুন মাসআলা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সমাধানে পৌঁছার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত উমর রা. কর্তৃক গঠিত মজলিসে শূরার সদস্যগণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন না, তাঁরা আইন প্রণয়নেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক, সামরিক কলা-কৌশলসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছাড়াও ইসলামী আইন সম্পর্কে ইজতিহাদ ও গভীর চিন্তা-গবেষণার পর উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হযরত আলী, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ, হযরত উসমান এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ। যেমন ঃ মদ্যপায়ীর শাস্তি আশি চাবুকাঘাত, ইসলামী বর্ষগণনা ইত্যাদি মজলিসে শুরার পরামর্শের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছে। হযরত 'উমর রা.-এর পরামর্শ সভা সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ র. (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ) বলেছেন ঃ

'হযরত উমর রা. সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ও আলোচনা করতেন যাতে উদ্ভূত সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছা যায়। এজন্যই তাঁর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়।'[৮] এ ধরণের পরামর্শসূলভ ইজতিহাদের প্রসিদ্ধ ঘটনা বিজিত ইরাক ও সিরিয়ার ভূমি বন্টনের সময় ঘটেছিল।

কিছু সাহাবী মতামত ব্যক্ত করলেন যে, বিজিত ভূমির ৪ ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং ১ ভাগ সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হযরত উমর রা. প্রতিরক্ষা, রাজস্ব ও রাষ্ট্রের

অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিজিত ভূমি সরকারী আয়ের উৎস হিসেবে জনগণের মধ্যে বন্টন করে সেগুলোর খাজনা দ্বারা উক্ত প্রয়োজন পূরণ করতে আদেশ দেন। এ অভিমতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন হযরত আলী, উসমান, তালহা এবং ইবন উমর রা.। কিন্তু এ ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। অবশেষে সকল সাহাবী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।[৯] হযরত উমর রা. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এসব সমস্যার সমাধান ইজতিহাদের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি সরকারি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল করেনি। আইনী সমাধানের বিষয়টিতে জনসাধারণের স্বাধীনতা দিয়েছে। যার ফলে উপযুক্ত যেকোন ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে পারেন। যাতে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের শাসকবর্গ রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোর জন্য ইজতিহাদকে অপব্যবহার না করতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ র.-এর বক্তব্যানুসারে হযরত উমর রা.-এর খিলাফত আমলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট দুটি কমিটি ছিল। একটির মধ্যে হযরত উমর ছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রা. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত রা. প্রমুখ সাহাবী ছিলেন, অন্যটিতে হযরত আলী রা., হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. ও হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. প্রমুখ সাহাবী রা. ছিলেন।[১০]

হিজরী প্রথম শতাব্দীর ইজতিহাদ প্রসংগে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ আমীন বলেনঃ মায়মূন ইবন মিহরানের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট কোন মুকাদ্দমা পেশ করা হলে তার সমাধান আল কুরআনের আলোকে করতেন। যদি আল কুরআনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমাধান না পেতেন তাহলে রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস অনুসারে করতেন। হাদীসেও সুষ্ঠু সুরাহা না পেলে সমকালীন জ্ঞানীগুণীদের সাথে পরামর্শ করতেন, তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতৈক্যে পৌছঁলে সে বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ফায়সালা দিতেন। আল মাবসূত গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম সারাখসী র. বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রা. নিজে ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে ফাতওয়া দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এলে তিনি বলতেন হযরত আলী রা., হযরত যায়েদ রা. ও অমুক অমুক ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাদের সাথে পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, তা-ই সমাধান দিতেন। ইমাম শা'বী র. বর্ণনা করেন যে, হযরত উমরের কাছে কোন মুকাদ্দমা এলে কোন জটিল বিষয়ে মাসব্যাপী সাথীদের সাথে সে বিষয়ের উপর চিন্তা-গবেষণা করতেন। আবার কোন সময় একই বৈঠকে অনেক সমস্যার সমাধান দিতেন।[১১] হযরত সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব-এর সূত্রে হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন-আমি একবার রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল- যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার ফায়সালা আল কুরআন ও আল হাদীসে নেই, তখন কিভাবে সমাধান করব। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ ক্ষেত্রে মু'মিন ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিদের পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধানের পথ খুঁজবে। শুধুমাত্র কোন এক ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে রায় দেবে না।[১২]

ইমাম আবূ হানীফা র.'র ইজতিহাদ পদ্ধতি

সাহাবীদের যুগের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা খলীফার পরিবর্তে রাজাদের অধীনে আসতে শুরু হলো, রাষ্ট্র পরিচালনার কাটামো পরিবর্তন হতে লাগল। অনেক বিজিত দেশ ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে আসল। তখন বিভিন্ন বাতিল ফিরকা (দল) নিজেদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশুদ্ধ হিসাবে প্রচার করার জন্য জাল হাদীস রচনা করতে শুরু করল। সকল সাহাবী রা. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পর উদ্ভূত সমস্যার সুসমাধানের কোন কেন্দ্রস্থল না থাকায় ইসলামী আইনকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন মুসলিম বিশ্বে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এক দল আলেম ছিলেন, যারা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইজতিহাদের মাধ্যমে মানুষকে আলোর দিশা দিতেন। এ সময় হযরত উমর রা. এর শূরার ন্যায় ইমাম আবূ হানীফা র. পরামর্শভিত্তিক ইজতিহাদ করেন। তাঁর পরামর্শসভায় বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত আলেমগণকে একত্রিত করেন। তাঁর গঠিত ফিক্‌হ বোর্ডের সদস্য ছিলেন চল্লিশ জন। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে একবার ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন যে, উক্ত বোর্ডের মধ্য হতে আটাশজন বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। ছয়জন কাযী পদের সকল যোগ্যতা রাখেন। এবং দু'জন কাযী ও বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার যোগ্যতা রাখেন।

ইমাম আবূ হানীফার জীবনীকার থেকে এটাও জানা যায় যে, তাঁর বৈঠকে প্রত্যেকটি মাসআলা স্বাধীনভাবে পুংখানুপংখ আলোচনা হতো। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক হতে বর্ণিত আছে যে, শুধুমাত্র একটি মাসআলা নিয়ে ক্রমান্বয়ে তিন দিন আলোচনা হয়েছিল। তৃতীয় দিন যখন সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিত হলো, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আলোচিত সমস্যাটির সমাধান হয়েছে।[১৩]

আল্লামা শিবলী নু'মানী স্বীয় 'সীরাতুন নু'মান' গ্রন্থে হযরত ইমাম আবূ হানীফা র.'র ইজতিহাদের পদ্ধতি প্রসংগে বলেন যে, ইমাম সাহেব যে পদ্ধতিতে ফিকহ এর সংকলন করেছেন, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও উঁচুমানের ছিল। তিনি বিষয়টি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদদের একাজে সংযুক্ত করেন। তৎকালীন সময়ে যারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে হযরত মুহাম্মাদ ইবন আবী যাদাহ, হযরত হাফছ ইবন গিয়াছ, হযরত কাযী আবূ ইউসুফ, হযরত দাউদ আত-তা'ঈ, হযরত হিব্বান র. প্রমুখ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইমাম যুফার র. মাসআলা উদ্ভাবনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত কাসিম ইবন মু'ঈদ র. এবং ইমাম মুহাম্মদ র. আরবী সাহিত্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা এসব ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ফিকহ বোর্ড তৈরী করে ইলমুল ফিকহ্ এর সংকলন শুরু করেন। ইমাম তাহাবী র. আসাদ ইবন ফুরাতের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর ফিকহ বোর্ডের সদস্য চল্লিশ জন ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবূ ইউসুফ, হযরত যুফার, হযরত দাউদ আত তা'ঈ, হযরত আসাদ ইবন উমার, হযরত ইউসুফ ইবন খালিদ তায়মী ও হযরত ইয়াহইয়া ইবন আবী যায়দা প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী র. আরো উল্লেখ করেন যে, লেখার দায়িত্বে ছিলেন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী যায়দা।[১৪]

মদীনার সাত জন শ্রেষ্ঠ ফকীহ

সাহাবীদের পরে ইমাম আবূ হানীফা র. ইজতিহাদী পরামর্শসভা, সমষ্টিগতভাবে ফিক্হ এর সংকলন ও প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি শুধু কুফার শ্রেষ্ঠ আলিমদেরকেই এ কাজে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং মুসলিম বিশ্বের সেরা পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদেরকে সদস্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে মদীনার সাত জন শ্রেষ্ঠ ফকীহও ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক র. বলেছেন যে, যখন তাঁর নিকট নতুন কোন মাসআলা পেশ করা হতো, তখন সে ব্যাপারে যৌথভাবে চিন্তা-ভাবনা করে গবেষণার শেষ প্রান্তে উপনীত না হলে তিনি এ ব্যাপারে অভিমত পেশ করতেন না।[১৫]

নতুন যুগের নতুন চাহিদা

এরপর তাকলীদের যুগ শুরু হলো। ফিকহ এর বিভিন্ন সংকলন সংকলিত হলো। সম্ভবত সংকলনের এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নেই। ইলমুল ফিকহ এর এ ভাণ্ডার কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতিরেকে যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলতে লাগল। সতের শ' খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে সাধিত হলো শিল্প বিপ্লব ও যান্ত্রিক বিপ্লব। নতুন নতুন উপকরণ ও আবিষ্কারে দ্বারা রাজনীতি ও কর্তৃত্বের প্রাসাদ কম্পিত হলো। মুসলিম বিশ্ব নিজের দুর্বলতা ও উদাসীন্যের কারণে রাজনৈতিক পরাজয়কে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হলো। মানুষের চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিরবর্তন সাধিত হলো। নতুন নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভব হলো। নৈতিকতায় ধস নামতে শুরু হলো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আসলো। মুসলমান শাসকদের অপকর্মের কারণে অর্থনৈতিক বাগডোর হাত ছাড়া হলো। এমন বহু নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও বাগডোর মুসলমানদের হাতে না থাকার কারণে সরকারীভাবে ও যৌথভাবে এসব সমস্যার ইসলামী সমাধান করা সম্ভব হলো না।

কঠোরত ও শিথিলতা

এখন যেসব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুমগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে মদ-জুয়ার সয়লাব, নাস্তিকতার দৌরাত্ম্য, নারীদের অধিকারের নামে কুরআন বিরোধী আচরণ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আল কুরআন, আল হাদীস ও রসূলুল্লাহ সা. শেষ নবী হওয়ার সুবাদে ইসলামের মৌলিক আইন চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এগুলোর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন করার প্রয়োজনও নেই এবং পরিবর্তনের কোন অবকাশও নেই। ইসলামী আইনের চতুষ্টয় প্রামাণ্য বিষয়ই হচ্ছে এগুলো। এগুলো অত্যন্ত ব্যাপক। উদ্ভূত সকল সমস্যা এরই নিরিখেই পরখ করতে হবে, এর বাইরে কেউ চেষ্টা করলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

আবার কিছু লোক এমন রয়েছেন, যারা বর্তমান পরিস্থিতি অবলোকন করা সত্ত্বেও ইসলামী আইনের শাখা-প্রশাখাগুলোকে অপরিবর্তনীয় মনে করেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ন্যূনতম

উদারতা থেকে হাত গুটিয়ে রাখেন। ইজতিহাদী ও কল্যাণধর্মী হুকুমগুলোও অকাট্য হুকুমের মতো অপরিবর্তনযোগ্য মনে করে থাকেন। এরা ইসলামের মূর্খবন্ধু। এরা ইসলামী শরীয়তের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অনবগত।

এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, শরীয়তে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর হুকুম অপরিবর্তনযোগ্য, যেমন 'ইবাদত সম্পর্কীয় বিধান, বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কীয় আইন, ফারায়েয এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বর্ণিত নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। বিভিন্ন ধরণের ইসলামী দণ্ডবিধি, প্রতিদণ্ড, পরিমাণ ও পরিমাপ এবং ঐ সমস্ত হালাল বিষয় যেগুলো নির্ভরযোগ্য অকাট্য তথ্য দ্বারা অনুমোদিত। আবার কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে বর্তমান যুগে আলেমদের চিন্তা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। যেমন ঃ

ক. এমন বৈধ বিষয় যার বৈধতার ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ বিবৃত হয়নি বরং বৈধ বা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে মৌনতা রয়েছে। এসব বিষয়গুলো মুবাহ্ (বৈধ) এর অন্তর্ভুক্ত। ফকীহগণ এসব মাসআলাকে 'আফউ (উদারতা) আখ্যা দেন। যেসব বিষয়ে হারাম হওয়া প্রসঙ্গে কোন অকাট্য প্রমাণ নেই সে বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 'আফউ' বলে উত্তর দিতেন। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা হালালকে বৈধ করেছেন এবং হারামকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বৈধ বিষয় হালাল এবং অবৈধ বিষয় হারাম, আর যেসব বিষয়গুলোতে মৌনতা অবলম্বন করেছেন সেগুলো 'আফউ'।[১৬] অধিকাংশ প্রশাসনিক আইন এই নীতির আওতাভুক্ত। এজন্য সর্বযুগে অবস্থার প্রেক্ষিতে কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে প্রশাসনিক আইন পরিবর্তনযোগ্য।

খ. আল কুরআন ও আল হাদীসে ব্যবহৃত এমন পরিভাষা যেগুলোর মর্মার্থ শরীয়ত প্রণেতা নির্ধারণ করেননি; বরং এগুলো সর্বকালে স্বীয় যুগের পরিভাষার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, কবজাহ (দখল, অধিকার), আদল (সাম্য, ইনসাফ) ইত্যাদি শব্দগুলোর সুনির্ধারিত মর্মার্থ উল্লেখ করেনি। এজন্য যুগের চাহিদানুযায়ী এগুলোর মর্ম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

গ. ইসলামী শরীয়তে শাস্তির বিধান প্রসঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, অপবাদ, ও ধর্মত্যাগ। এসব শাস্তি কার্যকর করাকে 'হুদূদ' (ইসলামী দণ্ড) বলে অভিহিত করা হয়। একজন মানুষ অপরকে হত্যা কিংবা শারীরিক ক্ষতি সাধন করলেও সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে, যাকে ক্বিছাছ (প্রাণদণ্ড) বা দিয়াত (রক্তদণ্ড) বলাহয়। এছাড়াও পৃথিবীতে অগণিত অপরাধ রয়েছে যে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ নেই, বরং রাষ্ট্র ও আদালতের এখতিয়ার থাকে আসামীর বিবরণ, সামাজিক ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে শাস্তি নির্ধারণ করার। শরীয়ত এভাবেই অপরাধ ও শাস্তির অধ্যায়ে বিচার বিশ্লেষণের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির বিধানগুলো অপরিবর্তনযোগ্য রেখে অন্যান্য অপরাধগুলো স্থান-কাল পাত্র

ভেদে পরিবেশ পরিস্থিতি, অভ্যাস, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যায়নে শাস্তির বিধানে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা। এ প্রসংগে হাফিয ইবন কায়্যিম র. (মৃঃ ১৩৫০ হি.) এর বক্তব্যই হচ্ছে সকল আলিম ও ফকীহদের অভিমত।

আইনের ব্যাখ্যা

আধুনিক যুগের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য ইসলামী আইনের মৌল বিধানগুলোতে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ সর্বসম্মত বিষয়সমূহ পুনঃ বিবেচনা করার দরকার নেই। তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকলে আধুনিক গবেষণার কাজ করতে হবে। যেমন–উদ্ভূত সমস্যার সমাধান আল কুরআন ও আল হাদীসে স্পষ্টভাবে অনুল্লেখ্য। বিগত যুগের ফকীহ ও গবেষকগণ এ ব্যাপারে নীরব। এমন অবস্থায়ই কেবল সংশ্লিষ্ট আইনের মূলনীতি ও বিধান তৈরী করতে হবে। এ ধরনের গবেষণামূলক কার্যক্রমকে 'তাহকীকে মানাত' (বিশ্লেষণমূলক বুনিয়াদ) বলা হয়। স্মর্তব্য যে, ইজতিহাদের স্তর তিনটি। যথা ঃ

(ক) প্রথম স্তর ঃ আল কুরআন ও আল হাদীসের কোন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হুকুমের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে এমন 'সবব' (কারণ) বের করা যা উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ভিত্তি হবে। এমন পদ্ধতিকে 'তাখরীজে মানাত' (বুনিয়াদী ব্যাখ্যা) বলা হয়। যেমন ঃ আল কুরআন 'খমর'-কে হারাম করেছে। হারাম করার পেছনে প্রথমতঃ এর কারণ খুঁজে বের করার প্রয়োজন রয়েছে। দেখতে হবে আঙ্গুর থেকে খমর তৈরীর জন্য কি তা হারাম হয়েছে? মিষ্টতার জন্যে হারাম হয়েছে? তারল্যের জন্য হারাম হয়েছে? না নেশার উপাদান থাকার জন্যে হারাম হয়েছে? এমন কারণ বের করাই হচ্ছে 'তাখরীজে মানাত'।

(খ) দ্বিতীয় স্তর ঃ সমস্যার বিভিন্ন কারণ সমূহের মধ্য থেকে ঐ নির্দিষ্ট কারণ বের করতে হবে, যা প্রকৃত পক্ষে বিধানটির কারণ হিসাবে নির্ধারণ করা যায়। এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতির নাম 'তানকীহে মানাত' (বুনিয়াদী পরিশোধন)। যেমন আঙ্গুর প্রকৃতপক্ষে একটি সুস্বাদু অনুমোদিত ফল। এর রস হারাম নয় কিন্তু এর রসে যখন নেশা জাতীয় উপাদান যুক্ত হয় তখন এটি হারাম।

(গ) তৃতীয় স্তর ঃ কারণ বা উপকরণ যেথায় পাওয়া যাবে, সেথায় ঐ হুকুম প্রয়োগ করা হবে। যেমন নেশার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে। এখন যেসকল দ্রব্যাদিতে নেশা পাওয়া যাবে, সেসবগুলো হারাম সাব্যস্ত হবে। এ ধরনের গবেষণাকে উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় 'তাহকীকে মানাত' বলা হয়। ইমাম আবূ ইসহাক শাতেবী যথার্থই বলেছেন যে, ইজতিহাদের উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের দরজা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় স্তর তথা তাহকীকে মানাতের স্তর কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।[১৭] পৃথিবীতে নব আবিস্কৃত বিষয় ও পদ্ধতির জন্য এ ধরনের ইজতেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে আমীরের হাতে বায়'আত গ্রহণের পদ্ধতি ইসলাম সমর্থিত। কিন্তু বর্তমান যুগে ভোটের

মাধ্যমে নির্বাচনসহ বেশ কিছু পরিবর্তন কি বায়'আতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে ? এ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংকের সাথে লেনদেনের কতিপয় পদ্ধতি সুদ হিসেবে অভিহিত হয়। ইন্সুরেন্সের কিছু স্কীম জুয়া হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এ্যালকোহল এর প্রয়োগ কখন অবৈধ, টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন সন্তানের বংশধারা নির্ধারণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আযল, গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয়ে 'তাহকীকে মানাত' তথা নতুন গবেষণা অত্যাবশ্যকীয়।

ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্ক

সমাজের বিভিন্ন উপকরণের উন্নতি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, আন্তদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানায় নতুন নতুন মেশিনের ব্যবহার অথবা অর্থনৈতিক সুশৃংখল কাঠামোগত পদ্ধতি যা ইতোপূর্বে ছিল না। যেমন ব্যাংকের লেন-দেননের পদ্ধতি, শিল্প-কারখানার ক্ষতিপূরণনের জন্য জীবনবীমা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সিকিউরিটি প্রভৃতি শরীয়ত অনুমোদিত নয় অথবা এগুলোতে সুদ রয়েছে ইত্যাদি বলে ক্ষান্ত হওয়া সমীচীন নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে ইসলাম সম্মত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। এছাড়া যুগের বিবর্তনে ইসলামী শরীয়ত পথনির্দেশিকা হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার অযোগ্য হয়ে যাবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে অনৈসলামিক বুনিয়াদ হতে পরিশুদ্ধ করে ইতিবাচক পদ্ধতি ও সর্বস্তরের জনগণের জন্য কল্যাণময় করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিভিন্ন মাযহাব থেকে উপকৃত হওয়া প্রসঙ্গে

উদ্ভূত সমস্যার মধ্যে যেসব সমস্যার সমাধান হানাফী ফিকহ এর ভিত্তিতে করা কষ্ট ও দুঃসাধ্য সে সব সমস্যার সমাধানে সমষ্টিগত প্রয়োজনে অন্য মাযহাব থেকে আংশিক উপকৃত হওয়া দোষের নয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্ক ও মুসলিম পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ মুফতীদের যৌথ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মাসআলা সম্পর্কে ব্যাপক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনের খাতিরে অন্য মাযহাব থেকে সাহায্য নেয়ার বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শাফি'ঈ মাযহাবের বিজ্ঞ আলিম 'আল্লামা যারকাশী র. বলেন ঃ নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বীয় মাযহাবের ইমামের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও অন্য মাযহাবের অনুসরণ বৈধ।'[১৮] আল্লামা যারকাশী র. শাফি'ঈ মাযহাবের বিজ্ঞ আলিম ইমাম নববী র.-এর ফতওয়া প্রসঙ্গে বলেন যে, 'প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী মাসআলার উপর আমল করা জায়েয।'[১৯]

হানাফী মাযহাবের ফকীহদের বক্তব্য

হানাফী মতাবলম্বী ফকীহদের চূড়ান্ত মত হচ্ছে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাযহাবের ফতওয়ার উপর আমল করা বৈধ। এ সম্পর্কে 'আল্লামা শামী র. বলেন ঃ

'ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ র. যেসব মাসআলার সমাধানে ঐকমত্য হয়েছেন সেসব মাসআলা থেকে ভিন্ন মত গ্রহণ বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের মতামতের উপর আমল বৈধ।[২০] যেমন হানাফী মাযহাব মতে, ঋণগ্রহীতার নিকট যদি এমন বস্তু থাকে যা ঋণ পরিশোধ করার পণ্যের ধরণের অর্ন্তভুক্ত হয়, তবে ঐ বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধ বৈধ হবে। আর যদি ভিন্ন ধরনের পণ্য হয়, তবে সে পণ্য দ্বারা ঋণ পরিশোধ বৈধ নয়। কিন্তু শাফি'ঈ র.-এর মতে ভিন্ন ধরনের পণ্য দ্বারাও ঋণ পরিশোধ বৈধ। 'আল-মুজতাবা'র গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, ভিন্ন ধরনের পণ্য দ্বারা প্রয়োজনের খাতিরে ঋণ পরিশোধ বৈধ হবে। আল্লামা শামী রহ.-এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের বিজ্ঞ আলিম কাহাস্তানী র.-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন ঃ

'উপরোক্ত সমাধান যদিও আমাদের মাযহাবের ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত নয়, তবুও জনসাধারণের প্রয়োজনের তাগিদে এ বিষয়ের উপর অপরাগতাবশতঃ আমল করবে।[২১]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. 'উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থের কারাহিয়্যাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ 'কুকুর ও শূকর এর খাবারের অবশিষ্টাংশ অপবিত্র, তবে ইমাম মালিক র.-সহ অন্যান্য ইমামদের মতে পবিত্র।' এখন যদি ইমাম মালিক র.-এর মতামতের উপর ফতওয়া দেয়া হয় তাহলে বৈধ হবে।[২২]

ফিকহ শাস্ত্রে এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যা হানাফী ফকীহদের বিপরীত মতামতের উপর আমল করা হয়। যেমন স্বামীর মধ্যে শারীরিক ক্রটি ও অসুস্থতার কারণে বিচ্ছেদের হুকুম, হারিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশ স্বামীর ব্যাপারে বিচ্ছেদের বিধান, আযান দেয়ার বিনিময়ে কিংবা কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ, কমিশনে ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক কালের ফকীহগণ ভিন্ন মাযহাবের মতামত গ্রহণ করে জনগণকে দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

অভ্যাস ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আইন পরিবর্তনের বিধান

যেসব মাসআলায় মুজতাহিদ বিভিন্ন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অভিমত প্রদান করেছেন, সে সব মাসআলাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাযহাবের ফতওয়া গ্রহণ করা যাবে। আর কোন অভিমত যদি স্বীয় যুগের পরিভাষা, প্রকৃতি এবং কল্যাণের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, তাহলে এ কার্যক্রমকে পরিবর্তন বলা হবে না। আল্লামা ইবন আবেদীন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ

'মানুষের পরিভাষা পরিবর্তনের কারণে অনেক আহকাম যুগের বিবর্তনে পরিবর্তন হয়। নতুন নতুন প্রয়োজন সমাগত হয়, নৈতিক পদস্খলনের সম্মুখীন হতে হয়। এ অবস্থায় যদি পূর্বের আদেশ বলবত রাখা হয় তাহলে লোকজনের দুর্ভোগ ও কষ্টের সীমা থাকবে না এবং শরীয়তের মূলনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হবে। অথচ শরীয়ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করার জন্যে এসেছে, আর শরীয়তের ইচ্ছা হচ্ছে পৃথিবী সুশৃঙ্খল ও উত্তম ভিত্তির উপর

সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুক। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনেরা মুজতাহিদের রায়ের বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এ যুগে যদি মুজতাহিদ জীবিত থাকতেন তাহলে ঐ ধরনের ফতওয়া দিতেন, যা এযুগের বিজ্ঞজনেরা দিয়ে থাকেন।'[২৩]

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা কিররানী র. উপরোক্ত বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

'যেসব আহকাম স্থানীয় রীতি-নীতির আলোকে সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর পরিভাষা পরিবর্তন সত্ত্বেও আগের হুকুম বলবত রাখা ইজমা' এর পরিপন্থী এবং ধর্মের মধ্যে অজ্ঞতা ছড়িয়ে দেয়ার শামিল। অথচ সতঃসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে শরীয়তের যেসব হুকুম পরিভাষা প্রকৃতির অনুকুলে প্রতিষ্ঠিত অনুমোদযোগ্য এসব পদ্ধতি হচ্ছে বিজ্ঞজনদের ইজতিহাদের ফসল। এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে।'[২৪] একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত, আর তা হচ্ছে কোন কোন কারণে যুগের বিবর্তনে ফিকহী আহকাম পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের পরিসীমা কীরূপ হবে তা ঐ প্রেক্ষাপটে না গিয়ে আগেই বলা মুশকিল। কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. নৈতিক স্খলন ঃ এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামের সূচনালগ্নে নৈতিকতার মান খুব উচ্চাঙ্গে ছিল। আল্লাহ তা'আলার নিকট ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার অনুভূতি, আখিরাতের চিন্তা-ফিকির এবং ঈমানী চেতনা অত্যন্ত উচ্চ মানের ছিল। সত্যিকার অর্থে আজ সেই চেতনা অবশিষ্ট নেই। নবী স.-এর যুগ ও সাহাবীদের যুগ থেকে পৃথিবী যত দূরে সরে গেছে, নৈতিকতার মানও তত নেমে এসেছে। আজ মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে; অন্যায় বা পাপের বিষয়কে পূণ্য মনে করা হচ্ছে; অবৈধ ও অন্যায় অভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্যে ইসলামী শরীয়তকে নিজের মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে। নৈতিকতার অধঃপতনের যুগে যেসব মাসআলা পূর্বের যুগে যে সকল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল অথবা অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, সে অবস্থার পরিবর্তন, নৈতিক শ্খলন রোধ ও পরবর্তী জনগণের কল্যাণ বিবেচনা করে অনেক বিধানের যুগোপযোগী বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন গচ্ছিত বস্তু হারিয়ে গেলে আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ নিয়মের আলোকে কারিগরি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখলে সে বস্তুর ক্ষতি পূরণ না দেয়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিজে ঐ গচ্ছিত বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারে এ সম্ভাবনায় তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হযরত উমর রা.-এর যুগে এ ধরণের ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়া হতো এবং তার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হতো না।

হযরত আলী রা.-এ অভিমতকে সমর্থন করে বলেন ঃ

'মানুষের কল্যাণ এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে।'[২৫]

তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে প্রথম স্বামীর নিকট প্রত্যাগমন করা বৈধ। এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে স্বামীর নিকট অর্পণ করার ইচ্ছায় বিবাহ করে। হাফিয ইবন কায়্যিম র. বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত উমর রা. এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীকে প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলার মত ব্যক্ত করেছেন। অথচ প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত ছিল।'[২৬] বিচারকের জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। এর পরও রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন ফাসিককে বিচারক নিয়োগ করেন, তাহলে সে বিচারকের আদেশ বাস্তবায়ন করা হবে কি না, এ ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ র. এর মতে এ ধরনের বিচারক নিয়োগ অবৈধ। 'মাজমা'উল আনহার' গ্রন্থে বর্ণিত আহনাফের এক বর্ণনা শাফি'ঈ র.-এর অনুরূপ।[২৭] তবে ইবন হুমাম (মৃ. ৮৬১ হি.) এর বর্ণনা মতে ফাসিক বিচারক মোতায়েন এবং তার আদেশ বাস্তবায়ন করা বৈধ।[২৮] ইমাম গাযালী শাফি'ঈ র. বলেন ঃ বর্তমান যুগে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আদেল মুজতাহিদ হওয়ার মতো উচ্চাঙ্গের শর্তারূপ করা কঠিন হয়ে যায়। এজন্য কোন শাসক যদি ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেয়, তাহলে তার বিচারকার্য বৈধ হবে।[২৯]

সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আল কুরআনে বলা রয়েছে ঃ

'তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষি হিসাবে গ্রহণ করবে।'[৩০]

উল্লেখিত আয়াতে বলা হচ্ছে সাক্ষ্যদানকারী উভয়কে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসিকের (পাপাচারীর) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এখন কোন বিচারক যদি ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না, এ প্রশ্নে ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮৩ হি.) বলেন ঃ 'ফাসিক ব্যক্তি যদি প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়, তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে এই কারণে যে, সে এহেন গুণাবলীর কারণে মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে।'[৩১]

ইমাম আবূ ইউসুফের এ রায় অন্য মাযহাবের লোকজনও গ্রহণ করেছেন। এমনটি যদি না করা হয়, তাহলে অধিকাংশ লোক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। কাযী তারাবলুসী র. বলেছেন ঃ

'কোন ব্যক্তি যদি গোপনে মদ পান করে এবং সে যদি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি হয়, তবে বিচার কার্যে তাকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে।'[৩২] কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী (মৃ. ১২২৫ হি.) বলেছেন ঃ

'আমাদের যুগে ফাসিক ব্যক্তি যদি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন লোক হয় এবং এ বিশ্বাস হয় যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না অথবা বিভিন্ন রীতি-নীতিতে তার সততার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।'[৩৩]

খ. রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব

অধিকাংশ ফিকহর কিতাব ইসলামী শাসনাধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ রেখে সংকলিত হয়েছে। মুসলমানদের কর্তৃত্বের প্রতি লক্ষ রেখে ফতওয়া দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী ফকীহদের কার্যক্রম থেকে জানা যায় যে, শরীয়তের মূলনীতির প্রতি অটল থেকে তারা এমন গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, যা ইসলামী ফিকহ এর প্রকৃতির অনুরূপ হয়। যেমন

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে এমন সব ইবাদতের বিনিময় নেয়া বৈধ নয়, যেগুলো মুসলমানদের ফরয পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন তাদের বক্তব্য ঃ

'আযান, ইক্বামত, কুরআন শিক্ষা, হজ্জ ও ফিকহ্ শিক্ষা ইত্যাদির বিনিময় নেয়া বৈধ নয়।'[৩৪]

উক্ত বিধানের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস প্রনিধানযোগ্য। হযরত বুরাইদাহ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন 'যে ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শিক্ষা দিবে, কেয়ামতের দিবসে সে গোশ্‌তবিহীন মুখমণ্ডল অবস্থায় উঠবে।'[৩৫] রসূলুল্লাহ সা. হযরত আমর ইবন আবিল আছ রা.-কে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিয়েছেন ঃ 'তোমাকে যদি মুয়াযযিনের দায়িত্ব দেয়া হয়, তবে বিনিময় নিয়ো না।'[৩৬] পরবর্তী যুগে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকার কারণে সরকারী বায়তুল মাল থেকে শিক্ষকদেরকে ভাতা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে জীবিকা অর্জনের তাগিদে তারা অন্য পেশা অবলম্বন করতে শুরু করেন। তখন ফকীহগণ কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয সাব্যস্ত করেন। ফকীহগণের বক্তব্য হচ্ছে 'যদি কুরআন শিক্ষার বিনিময় নেয়া অবৈধ হয়,তবে কুরআনের শিক্ষা স্থবির হয়ে যাবে। এতে দীন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।'[৩৭] বিখ্যাত ফকীহ বুরহানুদ্দীন মারগিনানী র. (মৃ. ৫৯৩ হি.) বলেনঃ 'আমাদের যুগের অধিকাংশ ফকীহ কুরআন শিক্ষার বিনিময় নেয়া বৈধ বলেছেন।'[৩৮] পরবর্তীতে ইমামতি, আযান দেয়া, ফিকহ্ এর মাসায়েল শিক্ষায় বিনিময় গ্রহণ বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়। তানভীরুল আবসার, দুররে মুখতার, মুনতাকা প্রভৃতি ফিকহ্ গ্রন্থে এ সিদ্ধান্তকে বিধিসম্মত বলা হয়েছে। পরবর্তী আলেমগণ এ বিষয়ের বৈধতার যুক্তি দিয়ে বলেনঃ

'এ যুগে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ জীবিত থাকলে তাদের পূর্ববর্তী বক্তব্য প্রত্যাহার করে শেষোক্ত বিধানকে বৈধ বলে মতামত ব্যক্ত করতেন।'[৩৯] অনুরূপ যদি কোন স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অথবা দুর্দশার কারণে স্ত্রীর খোরপোষ আদায়ে ব্যর্থ হয় কিংবা অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়া থেকে বিরত থাকে।' এমতাবস্থায় আহনাফের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদ করা যাবে না। বরং স্ত্রী স্বামীর নামে ঋণ নিয়ে খরচ করতে থাকবে।[৪০] মালিকী ও অন্যান্য মাযহাব মতে বিচারক বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন। এতে স্ত্রীর জন্য অন্য উপায় অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত হবে।[৪১] হানাফীদের রায় মূলত: ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা স্ত্রীর এহেন অবস্থায় বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় সরবরাহের বিধান ছিল। কিন্তু যুগের বিবর্তনে মুসলমানগণ যখন দারুল কুফরে বসবাস শুরু করল কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেল, এমতাবস্থায় স্ত্রী বিপন্ন হবে। এটা হবে নিতান্তই অবিচার। এজন্য মাওলানা আব্দুস সামাদ রহমানী র.-এর মতে এ প্রেক্ষিতে মালিকী মাযহাবের উপর হানাফীগণ আমল করবেন। বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন।[৪২]

গ. বিচার ব্যবস্থায় প্রচলন ও আচরণের প্রভাব

শরীয়তের হুকুমের বিরাট এক অংশ প্রচলন ও আচরণের উপর নির্ভরশীল। যেগুলো সম্পর্কে আল কুরআন ও আল হাদীসে স্পষ্ট সমাধান নেই। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক রীতি নীতি ও আচরণের আলোকে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সব রীতি নীতি কোন বিশেষ স্থান কাল অথবা নির্দিষ্ট এলাকার সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আইনের মর্যাদা লাভ করেছিল অন্য এলাকা বা কালের বিবর্তনে সেই আইনে পরিবর্তন হয়ে থাকে। আল্লামা কাররাফী মালিকী র. (মৃ.৬৮৪ হি.) বলেন: 'শরীয়তের যেসব বিধান প্রচলন ও রীতির অধীনে থাকে, প্রচলন বা রীতি-নীতি পরিবর্তনের কারণে আহকামেও পরিবর্তন হয়।'[৪৩] যেমন ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু বা সমতার বিধান। ইমাম আবূ হানীফা র.-র মতে সমতার ক্ষেত্রে পেশা, শিক্ষা, ব্যবসা ইত্যাদির সমতা অপরিহার্য। অর্থাৎ এক পক্ষের পেশা যদি নিম্নমানের হয় অপর পক্ষ যদি পেশাগতভাবে উঁচু মানের হয়, তাহলে পেশাগত বৈষম্যের কারণে সমতা ধর্তব্য হবে না। উঁচু মানের কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী নিচু মানের কোন পুরুষকে বিয়ে করলে অভিভাবক ইচ্ছা করলে বিচারকের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন। আল্লামা আলা উদ্দীন কাসানী হানাফী র. বলেন ঃ 'উপরোক্ত সমতার বিধানটি সামাজিক রীতি-নীতির সাথে সম্পর্কিত। ইমাম আবূ ইউসুফ র. বিচারক থাকা কালে পেশার তারতম্যের ব্যাপারটি গৌণ হতে শুরু করে, ফলে তিনি পেশাগত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রহিত করে দেন।'[৪৪]

ঘ. বিধান রচনায় আধুনিক উপকরণের প্রভাব

কিছু কিছু বিধান এমন রয়েছে পূর্ব যুগের ফকীহগণ নিজেদের যুগের প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রতি লক্ষ রেখে সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন। সে সময়ের দেয়া সমাধান যুক্তিসংগত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে উপকরণ ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের ফলে পূর্বের দেয়া বিধান অনুপযোগী ও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ঃ 'কিতাবুল কাযী ইলাল কাযী' বিষয়টি ফিকহী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অর্থাৎ কোন বিচারপতি মামলা সংক্রান্ত তথ্য খামে ভরে নিজের নামে সীল দিয়ে সীলগালা করে দু'জন লোক মারফত অন্য কোন বিচারপতির নিকট পাঠানোর আইন ছিল। নির্দেশ ছিল, পথিমধ্যে তারা উভয়ে কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। উদ্দিষ্ট বিচারপতির নিকট গিয়ে উভয়ে সাক্ষ্য দেবে, এই সীলগালা খামটি অমুক বিচারকের। বিচারকের সীল, দু'জন সাক্ষীর বিচ্ছিন্ন না হওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম উদ্দিষ্ট বিচারকের নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্য করা হতো।[৪৫] সেই যুগে এ পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত ছিল। ডাক বিভাগ ব্যতীত এই ধরণের নির্ভরযোগ্য, দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ অথবা যোগাযোগ কিংবা আলাপ আলোচনার আর কোন মাধ্যম ছিল না। পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ ইউসুফ র. সাক্ষী প্রেরণের এই বাধ্যবাধকতা রাখেননি, শুধুমাত্র কাগজপত্র প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। ইমাম সারাখসী র.-ও ইমাম আবূ ইউসুফের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৪৬]

কিন্তু আধুনিক কালে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা দলীল-দস্তাবেজ পৌঁছাতে এ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। মৌখিক সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য টেলিফোন, ওয়ারলেস, ভয়েল মেইস প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর লিখিত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ই-মেইল, ওয়েবসাইট, কুরিয়ার সার্ভিস, জিইপি, ইএমএস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং বিগত যুগের উপকরণ ব্যবহার করে কালক্ষেপন কিংবা অযথা কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বরং আনুধিক উপকরণ বা পদ্ধতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সুরাহা করা সম্ভব।
বিগত যুগের ফকীহগণ কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছে কিনা বা কোন নারীর সতীত্ব হরণ হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর পরীক্ষা তৎকালীন যুগের উপকরণ অনুযায়ী করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের উন্নত মেডিক্যাল প্রযুক্তির সহায়তা নিলে এসব ক্ষেত্রে খুব দ্রুত নিশ্চিত ফলাফল পাওয়া যায়। সুতরাং এসব নতুন উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষতি নেই। কারণ নব উপকরণ যদি বুনিয়াদী বিষয়ের নেতিবাচক না হয়, তাহলে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া অবৈধ নয়। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞজনের পরামর্শকে ফকীহগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উপসংহার

ফিকহ ইসলামী এমন একটি বিধান, যা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সমাজের মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মানুষের জীবনের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী ফিক্হ এমন মূলনীতি নিরূপন করেছে যা মানুষের প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। আবার কতগুলো মূলনীতি এমন যা কালের বিবর্তনে অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সমাজের উপকরণের সাথে মিল রেখে তৈরী করা হয়েছে, যা মানুষের মঙ্গলের জন্য পরিবর্তনযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রীক চিন্তা গবেষণার পরিবর্তে সমষ্টিগত গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমনটি হযরত উমর রা. ও ইমাম আবূ হানীফা র. করেছিলেন। যাতে করে ব্যক্তি কেন্দ্রীক ভুলের উদ্রেক হলে তা সমষ্টিগতভাবে পরস্পরের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সুধরিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সা. স্বয়ং এসব ক্ষেত্রে পরামর্শভিত্তিক ইজতিহাদ ও গবেষণার পথনির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ
'হে আল্লাহর রসূল সা. এমন কোন সমস্যা যদি আমার সামনে উপস্থিত হয়, যার সমাধান আল কুরআনে নেই, আপনার সুন্নাতেও অনুপস্থিত, সে অবস্থায় কী করতে পারি ? তখন তিনি বললেন, নেককার মু'মিনদের সাথে পরামর্শ করে সমাধানে পৌঁছবে, একক সিদ্ধান্ত নিবে না।'[৪৭]
একবার হযরত আলী রা. রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন,
'হে আল্লাহর রসূল, আমাদের সামনে যদি এমন কোন সমস্যা আসে, যার ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনটিরই সমাধান নেই, তখন কী করব ? রসূলুল্লাহ সা. বললেন- ফুকাহা ও

ইবাদতকারীদের সাথে পরামর্শ করবে; একাকী কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।'[৪৮]

মুসলিম বিশ্বের আলেমগণ এ ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন ছিলেন, যার কারণে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সমস্যার ফিকহী সমাধানের জন্য বিভিন্ন শরী'আ বোর্ড, ফিকহ্ বোর্ড, ফিকহী গবেষণাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হচ্ছে। ভারতে মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া র.-এর তত্ত্বাবধানে 'ইদারাতুল মাবাহিছিল ফিকহিয়্যাহ' গঠিত হয়। লক্ষ্ণৌতে 'মজলিসে তাহকীকাতে শার'ঈয়্যাহ', দিল্লীতে ইসলামিক ফিকহ্ একাডেমী ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিকভাবে রাবেতা আলম আল ইসলামীর তত্ত্বাবধানে 'মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ্দের গবেষণার আলোকে আধুনিক সমস্যার ইসলামী সমাধানে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশে 'মারকাযুদ দা'ওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, আল মারকাযুল ইসলামী, আল মারকাযুল বুহূস আল ইসলামী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বিআইআইটি, ইসলামিক গবেষণা সেন্টার, 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ', ফিকহ্ গবেষণার কাজ করছে। আধুনিক যুগের বিভিন্ন মাসআলার সমাধানের এটিই উত্তম পদ্ধতি। এর মাধ্যমে আমরা যেন ইসলামী ফিকহ্ এর চিরন্তনত্ব ও স্থায়িত্ব অটুট রাখতে পারি, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সেই তাওফিক কামনা করছি। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯।
২। আল কুরআন, সূরা আলে ইমরানঃ ৪৫।
৩। আল-মুওয়াক্কাত খ. ১, পৃঃ ৮৭
৪। ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন খ. ২, পৃঃ ১৫
৫। কিতাবুল ফুরুক, খ. ১, পৃ. ১৭৭।
৬। মাজাল্লাতুল আহকাম, ৩৯ বর্ষ।
৭। রাসাইল ইবন আবিদীন, খ.১, পৃ.১২৬।
৮। আল ফারুক, খ.২, পৃ. ১৫।
৯। ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে রজব হানবলী, আল-ইসতিখরাজ লিআহকামিল খিরাজ ঃ ৯)
১০। ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুল আছার, সাহাবাদের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ অধ্যায়।
১১। আহমদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, পৃঃ ২৪০, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
১২ হায়সামী, মাজমাউল বাহরাইন, খ. ১, পৃ. ২২৫)
১৩। মানাকিবুল মাক্কী, খ.২, পৃঃ ৫৪
১৪। আল্লামা শিবলী নু'মানী, সিরাতুন নু'মান, পৃ ২৫৫-২৫৬।
১৫। তাহযীবুত তাহযীব, অনুঃ সালিম ইবন আব্দুল্লাহ, খ. ৩, পৃঃ ৪২৭।
১৬। আল মুওয়াক্কাত, খ. ১ পৃ ১৬৬।
১৭। আল মুওয়াক্কাত, খ.২, পৃঃ ৫৭।
১৮। আল- বাহরুল মুহীত , খ. ৬, পৃ. ৩২৩।

২২। ইকদুল জায়্যিদ, পৃ. ৭৪।
১৯। প্রাগুক্ত, খ৬ পৃ. ৩২৬।
২৩। রাসায়েল ইবনে আবেদীন খ.২, পৃ. ১২৫।
২০। রাসমুল মুফতী, পৃ. ৭০।
২১। রদ্দুল মুখতার খ. ৩, পৃ. ২০০।
২৪। আল আহকাম ফী তাম'ঈযিল ফাতাওয়া, পৃ. ২৩১।
২৫। তারিখুল মাযাহিবিল ফিকহিয়্যাহ খ. ২, পৃ. ১৮।
২৬। ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন, খ.২ পৃ. ২৮।
২৭। মাজমা'উল আনহার, খ. ২, পৃ. ১৪৩।
২৮। ফাতহুল কাদীর খ. ৫, পৃ. ৫৪।
২৯। ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৫৪।
৩০। আল কুরআন, সূরা তালাক ঃ ২।
৩১। ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ১১।
৩২। মু'ঈনুল হুক্কাম, পৃ. ১৪৬।
৩৩। তাফসীরে মাজহারী খ. ১, পৃ. ৩২৭।
৩৪। হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭।
৩৫। মিশকাত শরীফ , খ. ১, পৃ. ১৯৪ - কুরআনের ফযীলত অধ্যায়।
৩৬। ইবন আবিদীন শামী, শারহু রাসমুল মুফতী, পৃ. ৩৮।
৩৭। হিদায়া, খ. ২, পৃ. ২৮৭।
৩৮। হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ৩০৩।
৩৯। শারহু রাসমুল মুফতী, পৃ. ৩৮।
৪০। মাজমাউল আনহার, খ.১, পৃ. ৪৯৮।
৪১। আন- নাফাকাহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, খ. ৪, প. ৫৮০।
৪২। কিতাবুল ফাসখ ওয়াত তাফরীক,পৃ. ৫৮।
৪৩। শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইদ্রীস কাররাফী মিসরী, আল আহকাম ফী তাম'ঈযিল ফাতাওয়া মিনাল আহকাম, পৃ. ৬৭-৬৮।
৪৪। 'আল্লামা আলা উদ্দীন কাসানী, বাদাইউস সানা'ই , খ. ২, পৃ. ৩২০।
৪৫। আলমগীরী, খ.৩, পৃ. ৩৮৩।
৪৬। আলমগীরী, খ.৩, পৃ. ৩৮৪।
৪৭। মাজমা'উয যাওয়াইদ, খ.১, পৃ. ১৭৮।
৪৮। হায়ছামী, মাজমা'উল বাহরাইন, খ.১, পৃ. ২২৫।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাওয়ায়েদুল আহকাম-১ম খণ্ড-২৯ পৃষ্ঠা।
২. উসূলুস সারাখসী-২ খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা।
৩. মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদের, আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু।
৪. সূরা আল হিজর-১৯-২০ আয়াত।
৫. সূরা তা-হা ৫৩-৫৪ আয়াত।
৬. সূরা আন নাহল-১৪ আয়াত।
৭। সূরা আল বাকারাহ-১৬৪ আয়াত।
৮। সূরা আল বাকারাহ-১৬৩ আয়াত।
৯। সূরা ইয়াসীন-৩৭ ও তার পরবর্তী আয়াত।
১০। সূরা আন নাহল-১২ আয়াত।
১১। সূরা আন নাহল-১৫-১৬ আয়াত।
১২। সূরা আল ইনফিতার-৬৮ আয়াত।
১৩। সূরা আত তারেক-৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।
১৪। সূরা আল কিয়ামাহ-৩৬-৩৭ আয়াত।
১৫। সূরা আল মুমিনুন-১২ আয়াত।
১৬। সূরা আল ওয়াকিয়া-৫৮-৫৯ আয়াত।
১৭। সূরা আল আনআম-৭৫ আয়াত।
১৮। সূরা আবাসা-২৪-২৫ আয়াত।
১৯। সূরা আবাস-৩২ আয়াত।
২০। সূরা আন নাহল-৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।
২১। সূরা আস সাজদাহ-২৭ আয়াত।
২২। সূরা আবাসা-২৪ আয়াত।
২৩। সূরা আর রুম-৮ আয়াত।
২৪। সূরা আন নাহল-১১ আয়াত।
২৫। সূরা আর রাআদ-৪ আয়াত।
২৬। সূরা আয যারিয়াত-২০-২৩ আয়াত।
২৭। কাওয়ায়েদুল আহকাম-১ম খণ্ড-৫৪ পৃষ্ঠা, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম-২১ পৃষ্ঠা।
২৮। সূরা তা-হা ১৩-১৪ আয়াত।
২৯। সূরা মারয়াম-৩৬ আয়াত।
৩০। সূরা আল ইসরা-২২-২৩ আয়াত।
৩১। সূরা আল কুরতুবী-১০ খণ্ড-২৩৮ পৃষ্ঠা।
৩২। জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম-৩১ পৃষ্ঠা। তাফসীর আল মানার, ১ম খন্ড-৫৮ পৃষ্ঠা।
৩৩। সূরা আশ শূরা-১৩ আয়াত।
৩৪। আল কুরতুবী ১৬ খণ্ড-১১ পৃষ্ঠা।
৩৫। আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু-১৯১ পৃষ্ঠা।
৩৬। আল কুরতুবী-১০ খণ্ড-২০৫ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড-২৩২ পৃষ্ঠা এবং আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু, ১৯১ পৃষ্ঠা।

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : October-December-2008. TK. 40